অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত রচনা

মীনকেতুর কৌতুক

[বাংলা সাহিত্যে একসময় বারোয়ারি উপন্যাস লেখার সূচনা হয়েছিল। এরসূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। তারপর অনেকএ-ধরনের উপন্যাস লেখা হয়েছিল। একজন লেখক শুরু করে একটা জায়গায় থেমে যেতেন; তারপর অন্য এক লেখকের দায়িত্ব পড়তো, সেই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার। এভাবে একদল লেখকের যৌথ উদ্যোগে এই বারোয়ারি উপন্যাস লেখা হতো। এমনই একটি উপন্যাস'মীনকেতুর কৌতুক'। তিনজন লেখক এইটি সম্পূর্ণ করেন—সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটি খুবইদুষ্প্রাপ্য। কলকাতার সমস্ত সেরা গ্রন্থাগারগুলিতে অনুসন্ধান করেও এর সন্ধান পাইনি। বৈশাখ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে এটি প্রকাশ করেন কাত্যায়নী বুক স্টল। বইটিতে যে কোনওকারণেই 'আখ্যাপত্র' ছাপা হয়নি। রাবার স্ট্যাম্পে দাম উল্লিখিত হয়েছে সাতটাকা।২২৪ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে উল্লেখ করেছেন বইটির ৯৭-২২৪ পৃষ্ঠাগুলি বিভূতিভূষণ লিখেছেন। তিনি বিভূতিভূষণের বন্ধু ছিলেন—তাঁর পক্ষে এটা জানা সম্ভব ছিল।

দুষ্প্রাপ্য এই উপন্যাসটি পড়ে আমার মনে হয়েছে বিভূতিভূষণ শুরু করেছিলেন ৯৩ পৃষ্ঠার শেষ থেকে। সেখান থেকেই শেষ অবধি এই উপন্যাসটি এই প্রথমবিভূতিভূষণের রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলো। ১ থেকে ৯৩ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ পর্যন্ত লিখেছিলেন অন্য দুই লেখক। আমরা সেই অংশের কাহিনীর সারসংক্ষেপ এখানেনিবেদন করছি, যাতে পাঠকেরা কাহিনীর সূত্রসন্ধান পেতে পারেন।

—নির্বাহী সম্পাদক।

কাহিনীসূত্র : কলকাতার এক ধনী পরিবারের শিক্ষিতা কন্যা সুমিত্রা। মা মারাগেছেন বলে বাবার আদরে তিনি খুবই স্বাধীন। তাঁর দুই সহপাঠিনীর মধ্যে অঞ্জলিটেনিস খেলোয়াড়—থাকেন সিমলায়। একটা টুর্নামেন্ট উপলক্ষে কলকাতায় এসেউঠেছেন সুমিত্রার বাড়ি। অন্য সহপাঠিনী ঊর্মিলা স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন।আপাতত তিনজনেই সুমিত্রার বাড়িতে। সুমিত্রাকে পছন্দ করেন বিলেত-ফেরতডাক্তার শিবপ্রসাদ সেন। অঞ্জলির সঙ্গে সিমলায় আলাপ হয়েছিল বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার সুপ্রকাশ রায়ের। সুমিত্রার বাড়িতেই সকলে পরিচিত হন। ঊর্মিলার সূত্রেসুমিত্রা পরিচিত হয়েছিলেন কলকাতার'অগ্রগামী' পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলাসাহিত্যের 'যুবরাজ' চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে। একদিন সকলে মিলে সিনেমা যাবার পথে সকলকে ফেলে রাস্তায় দেখা হওয়া চন্দ্রনাথকে নিয়ে চলে যায় ঊর্মিলা। ডাক্তার সেন চান সুমিত্রাকে পেতে। সুমিত্রা ধীরে ধীরে ভদ্র ও 'মার্জিতরুচি' চন্দ্রনাথের দিকে সংলগ্ন হয়ে পড়েন। অঞ্জলির সঙ্গে সুপ্রকাশের একটা বিনাসুতোর সম্পর্কের কথা ভাবা হলেও অঞ্জলি কখনও ডাক্তার সেন, কখনও চন্দ্রনাথের প্রতি ঝুঁকে পড়েন—সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু ডাক্তার সেন চান টাকা, অঞ্জলি অর্থবতী নন বলে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। ঊর্মিলা চান সুপ্রকাশ এবং পরে চন্দ্রনাথকে। তিনজনের মধ্যে অঞ্জলি বেশি সুন্দর। পুরুষ তিনজনের মধ্যে ডাক্তার মিশুকে নন, সুপ্রকাশ মিশুকে, চন্দ্রনাথ ধনীদের ভয় পান এবং সম্মান সম্পর্কে সচেতন। ঊর্মিলা এসেছিলেন ডাক্তারের কাছেআত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু ডাক্তার খোঁজ নিয়ে জানলেন তাঁর প্রচুর টাকা নেই। তখনইসিদ্ধান্ত নিলেন অঞ্জলিকে গ্রহণ করবেন না। তাঁর চাই কাঞ্চন আগে, পরে কামিনী।এরপরেই বিভূতিভূষণের রচনার আরম্ভ।]

সেই সময় অঞ্জলি চন্দ্রনাথের ঘরে বসে। পল্‌তার ও কলায়ের বড়া, পিঠে, মোয়াও তিলকুট সন্দেশ খেয়ে সে কাঁসার গেলাস তুলে এক চুমুক জল খেলে। এ খাদ্যগুলিসে যেমন জীবনে কখনও খায়নি, কাঁসার গেলাসে সে কখনও জল খেয়েছে বলে মনে পড়ল না।

গেলাসটির দিকে সে চাইলে, ঝক্‌ঝক্ করচে, আয়নার মত। আর এক চুমুক জল খেয়ে রুমালে মুখ মুছে সে চন্দ্রনাথের দিকে হেসে চাইল।

—কি সুন্দর খাবার আপনি আজ খাওয়ালেন! বোধ হয় আশ্চর্য হবেন শুনলে, আমি এসব খাবার কখনও খাইনি।

—খাবারের বেশি প্রশংসা করবেন না, মা শুনতে পেলে আর একদিন আপনাকেনিমন্ত্রণ করে বসবেন।

—আপনি না হয় করুন না। সাহস হয় না?

—ওটা আমার পক্ষে অসমসাহসিকতা হতে পারে—তবে সেজন্য নয়, যা দুর্লভতাকে সুলভ করতে গেলে তার আদর চলে যায়।

—দেখুন আপনাকে সত্যি বলছি, বাংলার কোন গ্রামে গিয়ে আমার বড় থাকতেইচ্ছে করে, চাষাদের জীবন জানতে ইচ্ছে করে—আমি বিদেশে মানুষ, মিশনারী স্কুলে পড়েচি, বাবার সঙ্গে সিমলে-দিল্লী করে জীবন কেটেছে। বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা—

—নাই বা জানলেন। আর বাংলাদেশকে কি আমরাই জানি?

—আপনি জানেন বৈকি, আপনার বইয়েতে গ্রামের কি সুন্দর ছবি এঁকেছেন, চাষাদের জীবনের কি বাস্তব চিত্র!

—বাস্তব চিত্র? আপনি বুঝলেন কি করে? আপনি তো চাষাদের জীবন দেখেননি। ও চিত্রগুলি যে বাস্তব তার প্রমাণ কি?

—কেন, আপনার বই-এর পেপার-কভারেতে ছাপা রয়েছে, এক সমালোচকেরমত—

—ও সমালোচক চাষী-জীবন সম্বন্ধে আপনার মতই অজ্ঞ। তিনি কৃষকদের ঘরেজন্মাননি, তাদের সঙ্গে কখনও থাকেনওনি। তবে আমাদের সঙ্গে দু-বার গ্রামে বেড়াতে গেছলেন। তাঁর কথাটা প্রচার করবেন না। রুশ-লেখকগণ শ্রমজীবী ও কৃষক জীবনের কিরূপ বাস্তব চিত্র এঁকে গেছেন, তাঁদের আর্ট কত বড়, আর বাংলাদেশেরসেবকরা অবাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করচে, এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে এ সমালোচকও খ্যাতিঅর্জন করেচেন।

—তিনি কি রুশিয়াতে গেছলেন?

—না, তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ পাঠকরেচেন, স্বীকার করি।

—কিন্তু আপনার বই পড়ে মনে হয়, আপনার উপন্যাসের চরিত্রগুলি খুব জীবন্ত, চিত্রগুলি বাস্তব—আপনি নিশ্চয় চাষাদের সম্বন্ধে খুব জানেন।

—আপনার সহজ সাহিত্য-বোধ আছে দেখচি। যা লিখেছি, অত্যন্ত সত্য, অতি বাস্তব হতে পারে, কিন্তু তা লিখে নাম হবে না, কারণ সে আপনার ভাল লাগবে না। যদি আমার লেখা পড়ে আপনি ভাবেন, এই সত্য, এই জীবন, যদি বাস্তবের অলীকরূপ আপনার সামনে সৃষ্টি করতে পারি যা দেখে আপনি খুশি হবেন, তাহলে লেখবারশক্তি-পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেলুম। আপনি সত্যই চাষীদের জীবন সম্বন্ধে জানতে চান, কারণ সে শুধু কষ্টকর ব্যাপার নয়, তার মধ্যে অনেক বীভৎসতা, নোংরামি, অশ্লীলতা আছে—অথচ দেখুন, ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে গ্রীষ্মের দিনে সরবৎ, শীতেরদিনে কফি খেতে খেতে আমার বই পড়ুন, তাতে একটি অলীক প্রেম-কাহিনীর সঙ্গেপ্রকৃতির বর্ণনা, কৃষক-জীবনের দুঃখ-নোংরামি নিক্তির ওজনে মেপে মিশিয়ে দেওয়াআছে, বেদনার সুরও আছে—মলাটে ছাপা আছে অতি বাস্তব চিত্র আপনি আরামে বিনা আয়াসে কৃষক-জীবনের বাস্তবতার জ্ঞান-লাভ করছেন, এ গর্ব অনুভব করতে লাগলেন—আর আপনারই মত ড্রয়িংরুমে বসে পড়া কোন যুবকের সঙ্গে তর্ক লাগালেন, কোন্ চরিত্রটা বেশি বাস্তব—

অঞ্জলি একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল,—ও, আপনি কি সিনিক! কিন্তু এ তো ফাঁকি, আপনারা আমাদের ঠকান দেখছি!

—যেহেতু আমরা সবাই সব সময়ে ঠকতে প্রস্তুত, ঠকবার জন্যে আমরা তৈরিহয়ে বসে আছি যে—

—সে কি রকম?

—জীবনেও কি আমরা সব সময়ে illusion তৈরি করছি না?

—মোটেই না, অন্তত আমি অত্যন্ত realist—আমি ওসব স্বপ্ন, সেন্টিমেন্টের ধারধারি না।

—তাহলেও দেখুন, আপনাদের সমাজের দুটি যুবকের মধ্যে একজন যদি আপনাকে নিভৃতে ডেকে বলেন, "আই লাভ ইউ", আর একজন যদি কথাপ্রসঙ্গেবলেন, আপনার নাকটা খাঁড়ার মত উদ্যত, তাহলে আপনি কাকে চায়ে নিমন্ত্রণকরবেন, ভাবেন?

—ও আপনি অসহ্য!

ভঙ্গুর চেয়ার ছেড়ে অঞ্জলি দাঁড়িয়ে উঠল। কব্জিতে-বাঁধা সোনার ঘড়ির দিকেচাইল।

চন্দ্রনাথ অতি বিনীতস্বরে বললে, দেরি হয়ে যাচ্ছে ভেবে যদি উঠতে চান তোউঠুন, কিন্তু রেগে উঠবেন না। আমাদের বাড়িতে আপনার এ অপূর্ব আগমনের স্মৃতিমধুর হয়ে থাক।

অঞ্জলি হেসে বসল।

—সত্যি বলতে কি, আপনার এ ঘরটি আমার বড় ভাল লাগচে, উঠতে ইচ্ছে করচে না। বিশেষত জানলা দিয়ে ওই পুকুরের ঘাটটি, how interesting!

—ওই ভাঙা শিবমন্দির দেখে একটি স্কচ্ মহিলা ঠিক এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

—আপনি কি আমায় তাড়াতে চান? কিন্তু আজ উঠি, সকালে চা খেয়েও বেরুইনি, সুমিত্রা নিশ্চয় ভাবচে। আর একদিন এসে হিঙের কচুরি ও ডালের বড়া খেয়ে যাব, যদিও আপনি নিমন্ত্রণ করচেন না।

—আপনার প্রশ্নের উত্তরটা তো স্থির হল না!

—কি প্রশ্ন?

—দ্বিতীয়বার প্রস্তাবের জন্য শিবপ্রসাদবাবুর হয়তো এতক্ষণে সুমিত্রা দেবীরবাড়িতে হাজির হয়েছেন, ড্রয়িংরুমের বারান্দায় নিশ্চয় অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করচেন।

—ও, আমি ভুলেই গেছলুম। যাক্, আমি এখন সুমিত্রার বাড়ি যাচ্ছি না। আমারএক পাঞ্জাবী বন্ধু ব্রেকফাস্টে নিমন্ত্রণ করেচেন, সেখানে যাব, এখান থেকে আলিপুরেযাবার পথটি কোন্ দিকে একটু দেখিয়ে দেবেন।

—তা হলে দু'মিনিট যদি অপেক্ষা করেন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—পথ দেখাবার জন্য আপনি অত কষ্ট করবেন কেন? আমি জিজ্ঞেস করে ঠিকচলে যাব।

—না, আমারও স্বার্থ আছে; আপনি মোটর হাঁকিয়ে যাবেন, আমি পাশে বসে যাব, পথে কি দু'চারজন বন্ধুও দেখতে পাবে না?

—দেখে কি লাভ?

—দেখুন, এই রকম একটা দৃশ্য কোন্ উপন্যাসে লিখেছিলুম, সবাই বললে, এ অবাস্তব, আজ তাদের কানের কাছে হর্ন বাজিয়ে জানিয়ে দেব, অভিজাত-জীবন সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাও আছে।

—সত্যই কি আছে আপনার?

—সে তর্ক থাক। মুশকিল আমার পাঠিকারা বেশির ভাগই পর্দানশীন, এ দৃশ্যটাদেখতে পেলেন না। যাক্ আমাকে চিড়িয়াখানার সামনে নামিয়ে দেবেন, আপত্তি নেইতো আপনার?

—চিড়িয়াখানার সামনে?

—হ্যাঁ, ওখানে আমি মাঝে মাঝে যাই। জন্তুদের হাবভাব পর্যবেক্ষণ করি, তারপরবাইরে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষদের সঙ্গে তাদের তুলনা করি—

—How interesting! চলুন।

সুমিত্রাদের বাড়ির সামনে এসে শিবপ্রসাদ দেখলে গাড়িবারান্দার নিচে এক বৃহৎমোটর কার দাঁড়িয়ে। সুপ্রকাশের মোটর কার। নিজের গাড়িটা সে গ্যারাজের দিকেরাখলে।

সামনের দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করলে না। পাশের এক দরজা দিয়ে বাড়িতে তার সর্বত্র প্রবেশাধিকার।

ড্রয়িংরুমের পাশে লাইব্রেরী-ঘরে সুমিত্রা ও সুপ্রকাশ বসে ছিল। সুমিত্রার চেয়ারেরপাশে ট্রলি-টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম।

দু'জনে চুপচাপ বসে, পেয়ালার চা এখনও শেষ হয়নি, সামনে রয়েছে। কোনকথাবার্তা শুনতে না পেয়ে শিবপ্রসাদ নিরাশ হল।ড্রয়িংরুমেও চুপ করে বসে থাকতেপারলে না। অধীরভাবে সে প্রবেশ করলে।

—গুড-মর্নিং ডক্টর!

সুপ্রকাশ দাঁড়িয়ে উঠল।

সুমিত্রা বললে, আপনি এত দেরি করে এলেন? অঞ্জলি তো কোন্ সকালে বেরিয়েগেছে। আপনার ওখানে যায়নি?

পিঠের উপরিভাগ একটু নেড়ে শিবপ্রসাদ বললে, না, আর তাঁর সঙ্গে আমি দেখাকরতে আসিনি।

বক্র অধরে হাসির রেখা টেনে সুমিত্রা তার দিকে কটাক্ষপাত করলে। শিবপ্রসাদ অপ্রতিভ হয়ে উঠল। কালকের ব্যাপারের সরস রিপোর্ট দিতে অঞ্জলি তাহলে দেরি করেনি!

—গুড-বাই ডক্টর, বললে সুপ্রকাশ ব্রিফে-ভরা চামড়ার ব্যাগটা টেবিল থেকে তুলেনিয়ে।

সুমিত্রা তার দিকে চেয়ে বলে, আপনি আর দশ মিনিট বসতে পারবেন না? আপনার সঙ্গে বিশেষ কাজ আছে, বাবা একটু পরেই নামবেন।

—দশ মিনিট আমি বসতে পারি, কিন্তু তার মধ্যে তিনি আসতে পারবেন কি? সত্যই আজ একটা কন্সালটেশান আছে।

—বোধ হয় একটু দেরি হবে। আচ্ছা আপনি বিকেলে আসতে পারবেন?

—বিকেলে আমি আসব, সেই ভাল হবে। আমি এ বিষয়ে ভেবেও আসব। আপনি বসুন ডক্টর।

শিবপ্রসাদ সুপ্রকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে। সুপ্রকাশের খালি চেয়ারটায় সেজোরের সঙ্গে বসে পড়ল। এ বাড়িতে সে তিলার্ধ ভূমি ছাড়তে রাজি নয়।

সুমিত্রা সুপ্রকাশের সঙ্গে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

শিবপ্রসাদের মনে ভয় হল। সুমিত্রার পিতার সঙ্গে সুপ্রকাশের কি জরুরী কাজ? আর এ বিষয়ে সুমিত্রারই আগ্রহ অধিক! বোধ হয় এর মধ্যেই সুপ্রকাশ সুমিত্রার কাছেবিবাহের প্রস্তাব করেচে।

—আপনাকে একা বসিয়ে রেখেচি, ক্ষমা করবেন।

সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে শিবপ্রসাদ চমকে উঠল। রাতে ভাল ঘুম না হওয়াতে আজ তারনার্ভ ঠিক নেই।

—আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে বলেই আজ সকালে এলুম।

—তাই ভাবছিলুম, রোগীদের ফেলে আজ সকালে—তারপর অঞ্জলিও সকালবেলা বেরিয়ে গেল, এখনও ফেরেনি—অঞ্জলিকে আমি আরও প্র্যাকটিক্যাল ভেবেছিলুম—তা আমার দ্বারা যদি কোন কাজ হয়—তবে ঘটকালি করতে আমি তেমন দক্ষ নই—

—আপনি ভুল বুঝছেন।

—আমি সব শুনেছি অঞ্জলির কাছ থেকে।

—আপনি সব ভুল শুনেছেন।

—ভুল? আপনারা কি কাল বনগাঁতে যাননি?

—গেছলুম, কিন্তু সেটা একটা—কি বলব—সাময়িক—

—সাময়িক উচ্ছ্বাস অথবা জ্যোৎস্নালোকের ক্ষণিক মায়া—

—ফ্লার্টিং বললে বোধ হয়—

কথাটা বলে শিপ্রসাদ নিজের জিভ কামড়ে ধরল। মাথাটা এখনও ধরে আছে, ঠিক কথাগুলি মাথায় আসছে না।

—ফ্লার্টিং! বা, বেশ চমৎকার!

সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে হাস্য করলে। তারপরে গম্ভীরকণ্ঠে বললে, দেখুন ডক্টর, আপনারভাব দেখে মনে হচ্ছে আপনি একটা জবাবদিহি দিতে এসেছেন। আমার কাছে কোনকৈফিয়ৎ দেবার আপনার কোন কারণ নেই, দরকারও নেই। এই সকালে রোগীদের ফেলে কেন এসেছেন আপনি? আর আপনার শরীরও বোধ হয় ভাল নয়, চোখ তোঅস্বাভাবিক লাল মনে হচ্ছে।

—আমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই।

—আপনি সুস্থ হয়ে কাল বিকেলে আসবেন, আর আজ আমার সময় নেই, বাবার শরীরটা হঠাৎ বড় খারাপ হয়েছে, হার্টটায় আবার ব্যথা। ডাক্তার সরকারকে তো টেলিফোন করেচি, কখন আসবেন জানি না, একটা জরুরী কাজ তিনি আজকের মধ্যে করে যেতে চান, আমাকেই তার সব ব্যবস্থা করতে হচ্ছে—

—আমাকে এতক্ষণ বলেননি কেন? আমরা দুজনে মিলেই তো করব।

—ক্ষমা করবেন। আপনি এখন বাড়ি যান। অঞ্জলি এখনও এল না!

সুমিত্রার এ গম্ভীর রূপ শিবপ্রসাদ কখনও দেখেনি। সে যা বলতে এসেছিল তাবলবার এ সুসময় নয়, তা সে বুঝতে পারল। অথচ চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিলনা।কথাবার্তায় হালকা সুর ফিরিয়ে আনা এখন শক্ত।

চাকর এসে খবর দিলে, সুমিত্রার পিতা সুমিত্রাকে ডাকছেন দোতলায়, আরব্যরিস্টার সাহেব যদি এসে থাকেন, তাঁকেও।

কথাগুলি শুনে শিবপ্রসাদ চমকে দাঁড়িয়ে উঠল।

সুমিত্রা স্থির দৃষ্টিতে শিবপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি অঞ্জলির জন্য অপেক্ষা করবেন? সে যে কখন আসবে কোথায় গেছে কিছুই বলে যায়নি। তবে যাবার আগে চন্দ্রনাথবাবুর ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ে গেল।

—ওই d—চন্দ্রনাথ! না, আমি আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই—শোনো, কেন তুমি আমাকে বার বার refuse কর—তোমার বাবার ইচ্ছা তুমি জানো, আজ তাঁরসঙ্গে কথা কয়ে পাকাপাকি করতে চাই—তুমি জানো আমি তোমাকে—

শিবপ্রসাদকে বাধা দিয়ে সুমিত্রা কম্পিত বক্র অধর দাঁতে চেপে বলে উঠল, আমাকে সত্যি ক্ষমা করবেন, এখন ফ্লার্টিং করবার একটুও আমার সময় নেই।

সিঁড়ি দিয়ে সে বেগে দোতলায় উঠে চলে গেল। জরির কাজকরা একপাটিচটিজুতো বাঁ পা থেকে খুলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে।

বৃহৎ বড় বাড়িতে বারোটি ফ্ল্যাট। মাসিক ঊনত্রিশ টাকা হতে সাতানব্বই টাকাভাড়ার নানা ধরনের ছোট বড় ফ্ল্যাট। দোতলায় পূর্বদিকে সব চেয়ে ছোট ফ্ল্যাটে ঊর্মিলাথাকে। দু'খানি ঘর, আর ছোট রান্নাঘর, সামনে একটু বারান্দাও আছে।

ঊর্মিলা একা থাকে। এ ফ্ল্যাট তার পক্ষে যথেষ্ট। একটি প্রবীণা ঝি তার বাজার, রান্না করে; রান্নাঘরের এক কোণেই রাতে শোয়।

সাত ভাইবোনেদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মেয়ে সে। তার এক দাদা কাজ করে মীরাটে, আর একজন দিল্লীতে; বোনেদের নানা জায়গায় বিবাহ হয়েছে, সবারই বৃহৎসংসার। তার দাদা ও দিদিরা যদিও বার বার তাকে বলে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে, সে কারো সংসারে থাকতে চায় না। তার কারণ, দিদিদের কাছে গেলেই তারা বলে এ সম্বন্ধটা বাপু খুবই ভাল, রাজি হয়ে যা। আর তারা পর্দানশীন যে কোথাও একটু হেঁটে বেড়াবার জো নেই। তার বড়দাদার কাছে যেতে ইচ্ছে করে, একমাত্র বড়দাদাই হচ্ছে তার এই স্বাধীন জীবনযাপনের পক্ষে। কিন্তু তার বড় বৌদিদির সংসার চালানোর ধরন দেখলে তার কেমন বিরক্তি আসে। ভোরবেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভূতের মতখাটেন, অথচ চারিদিকে এমন আগোছালো। ইংরাজীতে যাকে বলে 'ড্রাজারি' তারএমন ভীষণ রূপ দেখে নিজের সংসার করা সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়ে।

ফ্ল্যাটের পূর্বদিকটা খোলা। খানিকটা পোড়ো জমি, দু'তিনটে নারিকেল গাছ। লম্বাপাতাগুলিতে সূর্যালোক ঝলমল করে, চন্দ্রালোক ঝিক্‌মিক্ করে, অন্ধকার রাতেতারাভরা আকাশের নিচে গাছগুলি স্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

এই গাছগুলির দিকে চেয়ে ঊর্মিলাকত সন্ধ্যা একা বসে স্বপ্নজাল বোনে। বইপড়তে পড়তে মাঝে মাঝে তাদের দিকে চেয়ে দেখে, পরিচিত বন্ধুর মুখের মত।

রাত বেশি হয়নি। চারদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার; এখনও চাঁদ ওঠেনি। সেজন্য মনে হচ্ছে গভীর রাত্রি। টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে ঊর্মিলাবাইরে বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে চুপ করে বসল।

তার এ অশান্তি কেন? শ্রান্তি এসেছে। মাঝে মাঝে ভাল লাগে না এ জীবন। বোধ হয় বেশি ঘোরাঘুরিতে দেহ ক্লান্ত হয়েছে।

না, আর সে সুমিত্রদের সঙ্গে হৈ রৈ করবে না। সুমিত্রার সমাজে তার মেলবার যোগ্যতা কোথায়?অর্থাৎ তার টাকা নেই। সুমিত্রার মন এত খোলা, সে এমন আপনার করে সমান ভাবে মেশে যে সুমিত্রা ডাকলে সে 'না' বলতে পারে না।

তবু প্রভেদটা এবার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

টাকার জন্য সে লালায়িত নয়। সে নিজে কাজ করবে, আর তার মার কাছ থেকে যা পেয়েছে, তাতেই তার চলে যাবে।

ঊর্মিলার বাবা বিশেষ কিছু রেখে যাননি। তবে তার মায়ের পনের হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল। একমাত্র অবিবাহিতা কন্যারূপে মায়ের স্ত্রীধন সে পেয়েছে।

অর্থ তার জীবনের কাম্য নয়। আগে, বড়লোকদের সে শুধু অপছন্দ নয় ঘৃণা করত; কেউ টাকার গল্প করলে তার বিরক্তি হত।

অথচ সেই বিভবের গর্বভরা সমাজে সে কিছুদিন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমোদ করছে, আনন্দও পাচ্ছে।

তাদের টাকা আছে, তারা ধনবানের গৃহে জন্মেছে, সে জন্য তারা তো খারাপ লোকনয়। সুপ্রকাশের কথা তার মনে এল। একদিন সুপ্রকাশ হেসে বলছিল, আপনিসোসিয়ালিস্ট কিনা জানি না, কিন্তু আমার পিতা ধনী বলে, আমি কি কারণে ত্যাজ্যহব, বলতে পারেন কি?

সুপ্রকাশবাবুর কালকের প্রশ্নগুলি কিন্তু রহস্যজনক।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, আপনার গার্জেন কে?

ঊর্মিলা হেসে বলেছিল, গার্জেন? দেখুন, আমি স্কুলের ছাত্রী নই, আমি স্কুলেপড়াই। আমার গার্জেন আমি নিজে।

সুপ্রকাশ মৃদু স্বরে বলেছিল, সে তো দেখতে পাচ্ছি, তবু,—ধরুন—অর্থাৎ—

ঊর্মিলা বলেছিল, আপনি না ব্যারিস্টার, একটা কথা গুছিয়ে বলতে পারেন না?

সুপ্রকাশ যেন একটু করুণ সুরেই বলেছিল, দেখুন পরের কেস বেশ জোর করে ফুলিয়ে বলা যায়, কিন্তু নিজের কথা হলে—

ঊর্মিলা বাধা দিয়ে বলেছিল—তেমন জোর পান না, তাহলে চুপ করে থাকুন।

সুপ্রকাশ এবার বক্তৃতার সুরে বলেছিল, কিন্তু মানুষের ধর্ম হচ্ছে কথা বলা—চুপ করে থাকতে চাইলেও সে পারে না। কথার ভারে যার মন চাপা পড়ে বোবা হয়ে যেতেচায়, সে মূক হৃদয়ের কথা বোঝবার মত দরদী সংসারে ক'জন আছে বলুন? সেজন্যমানুষ অবিশ্রাম চেষ্টা করে, নিজেকে বোঝাতে। সে প্রয়াস বৃথা, লোকে ভুল বোঝে—

ঊর্মিলা অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠেছিল, আপনার বক্তৃতা এবার থামান। আজকাল কি বাংলা সাহিত্যের চর্চা করছেন?

সুপ্রকাশ একটু হতাশের স্বরে বলেছিল, সে শক্তি কোথায় বলুন? যদি লিখতে পারতুম বোধ হয় এত কথা বলতুম না। চন্দ্রনাথকে দেখে তাই মনে হয়। তার মনটা কথায় ভরা, ভাবের আগুনে টগবগ করে কথা ফুটছে, বেদনায় কথার তরঙ্গ উথলে উঠছে মনের মধ্যে, অথচ কেমন চুপচাপ থাকেন! মাঝে মাঝে যখন দু'একটি কথা বলেন, আমরা চমকে উঠি।

সুপ্রকাশ—বেশ কথা বলতে পারে সুপ্রকাশ! মিষ্ট মৃদুস্বর, হৃদয়ের আবেগ-ভরা। যেমন স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ, ভদ্র ব্যবহার, তেমনি কণ্ঠস্বর, তার কথা শুনতে শুনতে কেমনমোহ লাগে।

শিবপ্রসাদবাবুর গলার আওয়াজ এত কর্কশ কেন? চন্দ্রনাথ কথা বলে, যেন সে নিজের মনের চিন্তা উচ্চৈঃস্বরে বলছে; সব সময় বিশ্লেষণ করছে। কিছুক্ষণ ভাল লাগে, তারপর ক্লান্তি আসে।

কিন্তু সুপ্রকাশ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। এমন বিজন রাতের রহস্যময় অন্ধকারে বসে তার কথা শুনতে হয়। সে যদি এখন পাশে বসে গল্প করত!

নিজের মনের চিন্তাধারায় ঊর্মিলা চমকে যেন কোন ঘুমঘোর হতে জেগে উঠল।চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল বারান্দায়, ঘরেতে ঘুরে এল, এ দুর্বলতাকে জয় করতে।জীবনের লক্ষ্য হতে সে ভ্রষ্ট হচ্ছে।

নারিকেল গাছগুলির আড়ালে চাঁদ উঠল। ম্লান আলো।

চোখে তার ঘুম আসে না।

ঊর্মিলা আবার বারান্দার চেয়ারে বসল, ভাবতে নয়, স্বপ্নজাল বুনতে। মনকে এইঅজানা রঙীন কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে বেশ লাগে।

চাঁদের তরী ভেসে চলেছে অকূল নীলিমার রহস্যময় পথ আলো করে।

রাত আরও গভীর হয়েচে।

সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে ডাকলে, বাবা!

—কি মা?

—কই এখনও তুমি ঘুমোওনি? আবার কি ব্যথা হচ্ছে?

—ব্যথা নয় মা, চিন্তা!

—তোমার কিসের চিন্তা?

—তোর জন্যে ভাবি, বেবি। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

—কি যা তা বলো! চুপ করে ঘুমোতে চেষ্টা কর। গত বছরও তো তোমার এরকম attack হয়েছিল।

—তুই কি বুঝবি মা, কেন ভাবি। তোকে যোগ্যপাত্রে দিয়ে যেতে পারলে—সংসারবড় ভয়ানক জায়গা মা—

—যোগ্যপাত্র বললেই তো আসছে না। তুমি ভেবো না। এত ভাবলে অসুখ সারবেকি করে?

—জানলাটা একটু খুলে দে তো। বড় সুন্দর জ্যোৎস্না, চারিদিক বড় নিঝুম লাগচে।

—তুমি সেই পুরিয়াটা খাও, তা না হলে তোমার ঘুম হবে না।

—বেবি, আমায় একটু মন খুলে বল দেখি—

—কি বাবা?

—শিবপ্রসাদকে কি তোর অপছন্দ?

—তোমার কি পছন্দ?

—আচ্ছা থাক। সুপ্রকাশের সঙ্গে অঞ্জলির কি বিবাহের কোন কথাবার্তা হয়েছে?

—আমি তো শুনিনি।

—অবশ্য সুপ্রকাশের সঙ্গে তোমার আলাপ বেশিদিনের নয়—ওর প্র্যাকটিস কেমন খোঁজ নিতে পারলে হয়।

—বাবা, তুমি ভাল করে সেরে না উঠলে আমি এ সব কথা মোটেই আলোচনাকরব না। তুমি খালি শুয়ে শুয়ে ওই ভাবচ।

—আমি কি আর তেমন সেরে উঠব?

—কেন উঠবে না? আমার ভাল লাগে না এসব শুনতে।

—রাগ করিস না, বেবি; তোর মা যদি বেঁচে থাকতেন! আমি এ সব ঠিক বুঝতে, ব্যবস্থা করতে পারি না।

—এখন ঘুমোও বাবা।

—হ্যাঁ তুই ঘুমোতে যা। রাত বোধ হয় একটা হবে।

—তুমি না ঘুমিয়ে পড়লে আমি যাব না।

—আচ্ছা, তাহলে সেই পুরিয়াটা দে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

রাত আরও গভীর হয়েছে।

ঔষধটা খেয়ে বেদনার উপশম হওয়াতে সুমিত্রার বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুমিত্রার চোখে কিন্তু ঘুম নেই। মনকে সে শান্ত করতে পারছে না।

চাঁদ উঠেছে মধ্যগগনে। তার আলোক বড় তীব্র, রাত্রি বড় তপ্ত, মনে হল। সে আরভাবতে পারে না। নিচে বাগানে একটু বেড়ালে হয়। এ দীপ্ত জ্যোৎস্নলোকে খোলা বারান্দায় বা ছাদে থাকতে ইচ্ছা করে না। খোলা জানলা দিয়ে এত চাXদের আলো ঘরেএলে, বিছানা ভাসিয়ে দিলে, তার কেমন ঘুম আসে না।

সুমিত্রা ভাবলে, লাইব্রেরী-ঘর থেকে কোন বই এনে পড়বে, অথবা বাগানে কোনবড় গাছের ছায়ায় গিয়ে বসবে। এমন রাতে আলোছায়ায় বসে থাকতে ভাল লাগে, খোলা আকাশের নিচে দ্যুতিময় আলোকে নয়।

Is some melodious plot
Of beechen green, and shadow numberless.

কীট্‌সের সুবিখ্যাত ওডের লাইনগুলি মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

একটু বাতাস নেই, কোথাও কোন শব্দ নেই। মূক রাত্রির স্তব্ধতা তার বুক যেন চেপেধরে।

অর্ধেক সিঁড়ি নেমে সুমিত্রা চমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির রেলিং শক্ত করে ধরলে।

সিঁড়ির নিচে কে দাঁড়িয়ে! একটা কালো ছায়া। সমস্ত দেহ কালো, শুধু পায়ের নিচে চক্‌চক্ করছে।

কে? কে?

সুমিত্রা অস্ফুটস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আলোছায়াময় সিঁড়ি ভরে প্রতিধ্বনি উঠল, কে? কে?

নিদ্রাভরা বাড়ির স্তব্ধ অন্ধকার ঘরগুলি ভরে সে প্রতিধ্বনির সুর বেজে উঠল।

সুমিত্রা যেন ঘুমঘোর থেকে চমকে জেগে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকেচাইলে।

সে কালো ছায়া সরে গেছে। জরির-কাজ-করা তার একটি চটিজুতার পাটি চাঁদেরআলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে।

কালো ছায়া নেই, দেওয়ালের পাশে খানিকটা অন্ধকার। তবু সুমিত্রার মনে হল, ওখানে যেন শিবপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার প্রতীক্ষায় সে যেন সকাল থেকেদাঁড়িয়ে আছে।

সুমিত্রা সিঁড়ি দিয়ে আর নামতে পারল না। তার বুক দুরদুর করছে। চঞ্চলপদে সে দোতলায় উঠে গেল। ঘরের সামনে খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। আলোভরা খোলা আকাশ বড় ভাল লাগল। বেতের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসল।

এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

শিবপ্রসাদকে আজ তাড়িয়েছে, কিন্তু শিবপ্রসাদ কাল আসবে, পরশু আসবে।সহজে সে হার মানবে না।

কিন্তু অঞ্জলির সঙ্গে সে এরকম কাণ্ড করতে গেল কেন? তার জন্যে এখন সে বিশেষ অনুতপ্ত। অঞ্জলিও নির্দোষিণী নয়!

শিবপ্রসাদ সত্যই যদি তাকে ভালবাসত, সে এরকম ব্যবহার করতে পারত না।

শিবপ্রসাদকে সে প্রশ্রয় দিয়েছে সত্য। তার বন্ধুরা এ নিয়ে তাকে ঠাট্টাও করে।শিবপ্রসাদের মনে যদি কোন আশা জেগে থাকে তার জন্যে দোষ দেওয়া যায় না।

সুমিত্রা ভাবতে লাগল, দোষ তার থাকতে পারে, সেজন্য বিবাহ করতে হবে? বিবাহ সম্বন্ধে, নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে কোনদিন ভাবতে বসেনি। আজভাবতে গিয়ে সে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে।

—সুমি, এখনও ঘুমোসনি?

সুমিত্রা চমকে চাইল। হালকা হলদে রঙের ঢলঢলে সাজ পরে তার সামনে অঞ্জলিদাঁড়িয়ে।

—না, ঘুম আসছে না।

—কাকাবাবু ঘুমিয়েছেন?

—হ্যাঁ, বাবা ঘুমিয়েছেন, পুরিয়াটা খেতে হল। রাত কত হবে?

—বোধ হয় দেড়টা। একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সুমিত্রা স্বপ্ন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে না। বললে, ওই চেয়ারটায় বসো না, একটুগল্প করা যাক্।

—আচ্ছা এই মাঝরাতে বসে বসে কি এত ভাব্ছিস? চল, শুতে চল।

সুমিত্রা স্থির হয়ে বসে রইল দেখে অঞ্জলি একটা চেয়ার টেনে বসল।

সুমিত্রা ধীরে বললে, আজ সকালে শিবপ্রসাদ এসেছিলেন।

—সে তো জানতুম, সেজন্যেই তো সক্কালে বেরিয়ে গেছলুম।

—পালিয়ে গেছলি, বল!

—পালাব কেন? আর শিবপ্রসাদ তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।

—কি করে জানলি? কেন দ্বিতীয়বার—

—যা, ঠাট্টা করিস না। আচ্ছা, সত্যি বল দেখি, তোদের মধ্যে কি কোন ঠিক্ঠাকবা বোঝাপড়া হয়েছে? আমি ফর্মাল কিছু বলছি না, এমনি নিজেদের মধ্যে?

—কিচ্ছু না।

—শুনে নিশ্চিন্ত হলুম।

—কেন?

—ওই ডাক্তারটিকে আমার বাপু ভাল লাগে না। ও খাঁটি লোক নয়।

—পৃথিবীতে খাঁটি লোক ক'টা আছে?

—তা বটে, এ সংসারে অনেককে অনেক রকমই অভিনয় করতে হয়। আরখানিকটা অভিনয় না করলে বোধ হয় সামাজিক জীবন চলে না।

—চন্দ্রনাথবাবুর ছোঁয়া লেগেছে দেখচি।

—চন্দ্রনাথবাবুকে বড় ভাল লাগল আজ। কখনও ওঁর বাড়ি গেছিস?

—না।

—খুব পুরানো ভাঙা বাড়ি, বেশ রোমান্টিক। কিন্তু ও রকম বাড়িতে যে কি করেথাকেন, আশ্চয্যি!

—তুই চন্দ্রনাথবাবুকে বিবাহ করতে পারিস?

অঞ্জলি ভাবলে, সুমিত্রা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। সে সুমিত্রার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেচাইল। সুমিত্রার মূর্তি স্থির, কণ্ঠস্বর গম্ভীর। সুমিত্রার কি আজ মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

—আচ্ছা বিয়ে বিয়ে, সারাক্ষণ বিয়ের কথাই ভাবছিস কেন? চন্দ্রনাথবাবুকে বিয়ে করতে যাব কেন? এ প্রশ্ন ওঠেই না। রাত জেগে তোর বাপু মাথা গরম হয়ে গেছে।

—বিয়ে আমাদের করতেই হবে, একথা তো ঠিক?

—মেনে নিলুম, ঠিক। তবে আজ রাতেই তো করতে হচ্ছে না, কাল সকালেভাবলেও চলবে ওঠ, আমার ঘুম পাচ্ছে।

—বাবা বেশিদিন আর বাঁচবেন না। তোর কি মনে হয়?

অঞ্জলি ভীতভাবে সুমিত্রার দিকে চাইলে। সুমিত্রাকে আপন চিন্তায় এত মগ্ন বোধহল যে সে বোধ হয় তার কোন কথা শুনছে না, আপন মনে ভেবে চলেছে।

অঞ্জলি ধীরস্বরে বললে, সুমি, তোমার ভাবনা আমি বুঝি। কাকাবাবুর ইচ্ছা তুমিশীঘ্র বিবাহ কর। অথচ মনের মত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ কাকাবাবু যাকেবলছেন, তোমার বোধ হয় তাকে পছন্দ হচ্ছে না।

—দেখ, ব্যাপারটা এত সহজ নয়, এ সমস্যার সমাধান তোমাকেও একদিন করতে হবে।

চন্দ্রনাথের একটা কথা অঞ্জলির মনে পড়ে গেল। সে বলে উঠল, এ সমস্যারসমাধান নিজে ভেবেই করতে হবে।

সুমিত্রা বললে, ঠিক বলেছিস্। দেখ্ আমাদের মায়েদের এত ভাবতে হয়নি। তাঁদের বিবাহ তাদের বাবা মা ঠিক করে দিতেন, তাঁরা স্বচ্ছন্দচিত্তে তা স্বীকার করে নিতেন।

—আর আমরা স্বাধীন, শিক্ষিত; তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজেদের নিতে হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে উঠল। ঘর থেকে একটা শব্দ যেন তার কানেএল। বোধ হয় তার বাবা আবার জেগে উঠেছেন।

চারিদিক শব্দে ভরে উঠেছে। পথ দিয়ে দু'খানা মোটরগাড়ি দানবের মত দু-চক্ষুজ্বালিয়ে সশব্দে ছুটে গেল। বাতাসের আন্দোলনে বাগানে মর্মরধ্বনি জেগে উঠেছে।

সুমিত্রা অঞ্জলির হাত টেনে বললে, চল, শুতে চল। অনেক রাত পর্যন্ত তোকেবকালুম, কিছু মনে করিস না। বেশ সুন্দর তো তোর নাইট গাউনটা?

অকারণে সে আপন মনে হেসে উঠল।

সেই সময় চন্দ্রনাথ তার উপন্যাসের একাদশ অধ্যায় লেখা শেষ করে ঘড়ির দিকে চাইল। দুটো বাজে। পুকুরের জলে চাঁদের আলো ঝিকিমিকি করছে। গাছগুলি জড়ামড়ি করে গভীর অরণ্যের মত দেখাচ্ছে। ভাঙা শিবমন্দির হতে যদি মশাল হাতে কতকগুলি ডাকাত বাহির হয়ে আসে, অথবা "কপালকুণ্ডলার" কাপালিকের মন্ত্রপাঠশোনা যায়, তাতে আশ্চয্যি হবার কিছু নেই।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে উঠল। আরও দশ পাতা লিখতে পারলে হত, কিন্তু ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে! কিন্তু ভয়ঙ্করঘুম পেয়েছে।

উপন্যাস লেখা যে কি শ্রমসাধ্য তা যদি পাঠকেরা জানত। পাঠকেরা ভাবে, লেখক লেখে মনের আনন্দে, লেখক লেখে ভাবের প্রেরণায়। প্রেরণা আসে সত্য, সৃষ্টির পরমানন্দ আছে, বেদনাও কম নয়, কিন্তু দিন-মজুরের মত খাটতেও হয়।

ইচ্ছা ছিল শুক্লবসনা নিশীথিনীর দিকে চেয়ে বসে থাকবে, স্বপ্নজাল বুনবে। কিন্তুসময় কোথায়? সম্পাদকের তাগাদা, প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা অগ্রিম নেওয়ারয়েছে। কফি খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কথার পর কথা সাজিয়ে গড়তে হবে উপন্যাসের জগৎ।

আলো নিভিয়ে চন্দ্রনাথ শুয়ে পড়ল।

এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছে। বিছানায় শুয়ে কিন্তু ঘুম আসে না।

অশরীরী কারা ঘরের ভেতর ভিড় করে আসে। তার কল্পনার সৃষ্টি সব। বাস্তব জগৎ অবাস্তব ছায়াময় হয়ে যায়। কল্পলোকের অলীক নর-নারী সব বাস্তব, জীবন্তহয়ে আসে। জীবনের রূপ যায় বদলে। যে মাপকাঠি দিয়ে পৃথিবীর সব লোক জীবনের ভালমন্দ, সুখদুঃখ, সম্পদ দারিদ্র্যের হিসাব করে, সে মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতেগেলে ভুল হয়ে যায়। লোকে বলে, এ বোকা, এ কিছু বোঝে না। যে গভীর দৃষ্টি দিয়েসে পৃথিবীর প্রবহমান জীবনধারা দেখছে, সে দৃষ্টি অন্যলোকের নেই, একথা সে কেমনকরে বোঝাবে?

মাথার বালিশটা উল্টে চন্দ্রনাথ চোখ বুজলে।

মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। তার নুতন উপন্যাসের নায়িকা, বিদ্যুৎপর্ণা। সেবলছে, তুমি আমায় সারারাত জাগিয়েছ, আমি তোমায় ঘুমোতে দেব ভেবেছ!

চন্দ্রনাথ উত্তর দিলে, দেখ, সমস্ত দিন তোমার কথা ভাবছি। তোমার কথা ভেবেলিখতে গিয়ে আমার নিজের কথা ভাববার একটুও সময় পাইনি। আজ যে আমার বাড়িতেঅঞ্জলি এল, এই আকস্মিক অভূতপূর্ব আগমনের কথা একটু ভাবতে পাইনি। কেন সেএল?আমার সঙ্গে শুধু একটু গল্প করতে? তারপর, কাল যে সুপ্রকাশের বৃহৎ মোটর কারে ঊর্মিলাকে দেখলুম, তার মুখ চোখ জল্‌জ্বল্ করছে, ঊর্মিলা কি সুপ্রকাশের প্রতিঅনুরক্তা হল? এ সব কথা একটুও ভাববার সময় পাইনি। শুধু তোমার কথাই ভেবেছি, লিখেছি। তবু তুমি ঈর্ষাপরায়ণা কেন? ওগো মোহিনী, মুক্তি দাও, শান্তি দাও।

বিদ্যুৎপর্ণা, অঞ্জলি আজ কেন এল বলতে পার? ঊর্মিলা আমায় ভালবাসে কি না বলতে পার?

কি প্রশ্ন করলে?আমি ভালোবাসি কি না? ভালোবাসা কি?

রাত দুটো বেজে গেছে। কাল সকালে উঠে আবার তোমার বন্দনা-গান রচনায়বসব। এখন তুমি যাও, বিদ্যুৎপর্ণা। নিজের কথা একটু ভাবতে দাও।

ঊর্মিলা কোন্ পথে চলল? আজ বিমুগ্ধা হয়ে কি পথ ভুল করছে? কাল একবার ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমায় একটু সময় দিও।

পরদিন সকালে চন্দ্রনাথ আর উপন্যাসটা লিখলো না। সে ঊর্মিলাকে চিঠি লিখতেবসল।

তার মাথার ভেতর যেন দুই বিভিন্ন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বিদ্যুৎপর্ণারকথা লিখতে বসে, ঊর্মিলার চিন্তা এসে ধাক্কা দেয়। ধীর প্রবহমান নদীর গর্ত হতে যেন কোন্ ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণাবর্তের মত ওপরে উঠে আসে, চারিদিক আলোড়িত, আন্দোলিত হয়ে যায়। শুধু মনকে শান্ত করতে সে চিঠি লিখতে বসল।

"ঊর্মিলা!" কথাটা লিখে চন্দ্রনাথ ভাবতে লাগল, এ চিঠি লেখা নয়, এ তার মনোবিশ্লেষণ। ঊর্মিলার প্রতি তার সত্যিকার মনোভাব কি, সে জানতে চায়।

চন্দ্রনাথ লিখল,

ঊর্মিলা,

তোমার সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যে তোমায় চিঠি লিখতে বসলুম, তার কারণ, শুধু আমার আলস্য নয়। অথবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই না, তাও নয়।

লিখছি এই জন্যে যে, কথা বলার চেয়ে লেখা সুস্পষ্ট সুচিন্তিত হয়। আর লেখায় চিন্তাধারা অপ্রতিহত বেগে চলতে পারে। আমি যা বলতে চাই, তা তোমাকে চুপ করেশুনতে হবে, উত্তরের ধাক্কা দিয়ে কথার স্রোতকে তুমি থামাতে বা মোড় ফেরাতেপারবে না। আর যা উত্তর দেবে তা তোমায় ভেবে দিতে হবে। কথা বলার মধ্যে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়, তা ভেবে হয় না। হঠাৎ আবেগে বা তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্য বা পরিহাস করবার জন্যে লোকে অজানিত ভাবে যা বলে ফেলে, পরে তার জন্যে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু উপায় থাকে না। কথা কওয়া অনেকটা বাণ ছোঁড়ার মত, সব সময় লক্ষ্য ঠিক করে ছোঁড়া হয় না, ঠিক লক্ষ্যেও সব সময় লাগে না, অথচ একবার ছুঁড়লে তাকে ফিরিয়ে আনবার উপায় নেই।

দেখ, আমার মন আসল কথাটা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। তোমার কথা আমিপ্রায়ই ভাবি। তোমার সম্বন্ধে একটা দায়িত্ব অনুভব করি। তোমার সুখঃদুখের জন্য আমার যেন কিছু করবার আছে।

কেন এরূপ ভাবি? তোমার জন্য কেন আমার অন্তরে বেদনা?

তুমি বলবে, আমি তোমায় ভালবাসি কি না, এটা আমি জানতে, বুঝতে চেষ্টাকরছি।

এবং, তুমি আমায় ভালবাস কি না এটাও আমি জানতে চাই।

ভালবাসা কি, তার প্রকৃতি ও স্বরূপের বর্ণনা পৃথিবীর এত কবি, এত লেখকসম্পূর্ণভাবে এখনও দিতে পারল না। বিশ্বস্রষ্টা এই অপরূপ সৃষ্টির আড়ালে নিজেকেযেমন অজ্ঞাত রহস্যময় করে রেখেছেন, তেমনি তিনি এই অপূর্ব ভালবাসাকে অবর্ণনীয়রহস্যাবৃত করে দিয়েছেন। তার কত বিভিন্ন রূপ, কত আকস্মিক প্রকাশ! কোন্টা তারসত্য রূপ, কোন্টা মিথ্যা, কোন্টা ক্ষণিক অনুভূতি, কোন্টা চিরন্তন, এ সব প্রশ্নের কোনসঠিক উত্তর কে বলতে পারে!

তবু জীবনে ভালবাসার যখন কোন বিশেষ প্রকাশ হয়, যখন কোন তীব্র অনুভূতিতেঅপূর্ব আনন্দে বা বেদনায় অন্তর আন্দোলিত হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন জাগে, এই কিভালবাসা?

তোমার মনেও এই প্রশ্ন জেগেছে, জানি। সেজন্য তোমাকেও ভাবতে বলছি। এ ভালবাসা যদি ক্ষণিক মোহের কুজ্‌ঝটিকা হয় তো চিরন্তনের তীক্ষ্ণ সূর্যালোকে কেটে যাবে। এ ভালবাসা যদি যৌবন-লালসার অন্ধ গহ্বর হয় তো মনন-প্রদীপের শিখায় দীপ্ত হয়ে উঠবে। এ ভালবাসা যদি সুদূর আকাশের অলভ্য শুকতারা হয় তো বুদ্ধিরঅরুণোদয়ে মিলিয়ে যাবে।

মনে পড়ছে তোমার ছেলেবেলার কথা। তখন তুমি যেমন চঞ্চলা তেমনি একগুঁয়েছিলে। আর নীরবে কষ্ট সহ্য করবার শক্তি তখন থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। আমার মাথা তখন দুষ্টামি বুদ্ধিতে ভরা থাকত। অকারণে তোমাকে কষ্ট দিতুম।

খুলনায় নদীতীরের বাড়িটি ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছে। খুব স্পষ্ট নয়, ইমপ্রেসনিস্ট-স্কুলের বর্ণবহুল তৈলচিত্রের ঔজ্জ্বল্য নেই, কাঠ-খোদাই-এর কালোআবছায়ার মত।

আমাদের বাড়ি পাশাপাশি ছিল। বাড়িতে তোমার মেয়েলী কাজে গল্পে মন বসতনা।তুমি চলে আসতে সেই পোড়ো মাঠে, যেখানে ছেলের দল ঘুড়ি ওড়াত, লাট্টু, ঘোরাত, ডাংগুলি খেলত। কিন্তু আমরা তোমাকে আমলই দিতুম না।

দুষ্টামি করে, মাঞ্জা-দেওয়া ঘুড়ির সুতো তোমাকে টেনে ধরতে বলে একবার তোমার আঙুল কেটে দিয়েছিলুম, মনে পড়ে? দুটো আঙুল রক্তাক্ত হয়ে গেল, তুমি কিন্তু একটুও কাঁদনি, বাড়িতে গিয়ে বলেও দাওনি। সেই তেজোময়ী বালিকার ক্ষুব্ধব্যথাভরা মুখ মনে পড়ছে।

তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমাকে কালীপুজোর সময় তুবড়ি তৈরি করবার প্রক্রিয়াদেখিয়েছিলুম, কয়েকটি তুবড়িও দিয়েছিলুম বোধ হয়।

ছেলেবেলার সে দিনগুলো ভাবলে মনটা হালকা হয়ে আসে। ভাবি, তখনপৃথিবীকে যে চোখে দেখতুম, সেইটা কি সত্য দেখা, না আজ যে চোখে দেখছি, সেইটা সত্য দেখা?

তারপর মাঝখানে লম্বা ছাড়াছাড়ি। কলকাতায় কলেজে যখন পড়তে এলুম, সম্পূর্ণভাবে তোমায় ভুলে গেছি।

কত বছর পরে আবার দেখা। সকালে ল'কলেজের ক্লাস করে দ্বারভাঙ্গাবিল্ডিং-এর বড় সিঁড়ি দিয়ে নামছি, দেখলুম, একটি মেয়ে একগাদা বই হাতে করেচঞ্চল পদে উঠে চলেছে। হঠাৎ সে থামল, আমার দিকে এগিয়ে এমনভাবে মুচকেহাসল যে, সেটা প্রীতিসম্ভাষণের হাসি না পরিহাসের, তা ঠিক বোঝা গেল না।

হেসে তুমি বললে, বা, চিনতে পারছেন না বুঝি? কিন্তু আমি আপনাকে চিনেছি।

অর্থাৎ এত গভীর ভাবে গেলে কি হবে, তুমি তো সেই দুষ্টু ছেলেটি বই আর কেউনয়! খালি ইংরাজী বানান ভুল করতে, আর অঙ্কতে ফেল করেছিলে, মনে আছে?

তোমার কণ্ঠস্বরে ও চোখের চাউনিতে তোমায় চিনলুম। সিঁড়ি দিয়ে তোমার সঙ্গেউঠে গেলুম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পুরাতন দিনের গল্প শুরু হল। মুগ্ধ নেত্রে তোমার দিকেচেয়ে রইলুম। চঞ্চলা বালিকা বি. এ. ফার্স্ট ক্লাস পাশ পেয়ে এম. এ. পড়তে এসেছে, এ কারণে মুগ্ধতা নয়। তোমাকে দেখলুম নবরূপে। এ কোন্ রহস্যময়ী নারী এল আমার জীবনে!

পরদিনই তোমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলুম। বলেছিলুম বটে, বিয়ের ভোজ তোহল না, পাশের ভোজের দাবি করতে এসেছি। কিন্তু তোমার যে বিয়ে হয়ে যায়নি, সেকথা ভেবে আনন্দিত হয়েছিলুম।

তুমিও আমায় দেখে খুব খুশি হয়েছিলে। অন্তত আমার সেই রকম মনে হয়েছিল।

আমার আড়ষ্ট ভাব, আমার গাম্ভীর্য দেখে তুমি ঠাট্টা করেছিলে। সেদিন আমারঅন্তরে যে আনন্দ-বন্যা উথলে উঠেছিল, তাকে মুক্তি দিলে তুমি—বলতে, পাগল অথবাপ্রেমিক।

তোমার চোখেও কি সেদিন প্রেমের অঞ্জন লেগে ছিল? মনে কি হয়েছিল, বড়সুন্দর এই সূর্যালোকিত পৃথিবী, অপূর্ব রহস্যময় এই অজানা-মানবজীবন! মনে কিহয়েছিল, আমাদের চারিদিকে কোন্ নবীন জগতের সৃষ্টি হল! এ অনির্বচনীয়!

চন্দ্রনাথ লেখা থামিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। এ কি লিখে চলেছে সে!

কোথায় সেই নবীন পুলক, নবীন জগৎ? শরৎ-ঊষার পূর্ব গগনের সোনারআলোকের মত সে অপূর্ব স্বপ্ন কবে মিলিয়ে গেছে। যৌবন-পথে প্রথম দেখা ঊর্মিলারসঙ্গে আজ প্রতিদিনের ঊর্মিলার কত প্রভেদ।

স্মৃতির ঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলতে এ সব কারা বাহির হয়ে এল!

না, ঊর্মিলাকে চিঠি লেখা চলবে না। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বাস্তব ঊর্মিলারজায়গায় এ কোন্ মানসী ঊর্মিলাকে বসিয়ে তার সামনে মনের অন্ধ গুহাতলের অজানাঅধিবাসীদের এনে হাজির করছে, কথার কুহকে ভুলে অজ্ঞান পথে সে চলেছে।

চিঠিখানি চন্দ্রনাথ ছিঁড়তে পারল না। নিজ রচনার প্রতি যেমন মমতা বোধ হয় তেমনি মমতা বোধ করলে।

পুকুরের জলে রোদ ঝিকিমিকি করছে। একটা বোলতা ঘরে ঢুকেছে, সব জানালাদরজা খোলা, তবু সে বাহির হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, ভোঁ ভোঁ করে দেওয়ালে মাঝেমাঝে মাথা ঠুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মনটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। মাথা হালকা লাগছে। বিনিদ্র রাত্রির অশান্ত জ্বালাআর নেই।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলাই ভাল।

চন্দ্রনাথ চিঠির পাতাগুলি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

ঊর্মিলাকে সে ভালবাসে কি না, প্রশ্নটা মুলতুবি থাকতে পারে।

সুপ্রকাশ সত্যই ঊর্মিলাকে বিবাহ করতে চায় কিনা, সেইটাই জানা দরকার।

তার নিজের জন্য নয়, ঊর্মিলার মঙ্গলময় ভবিষ্যতের জন্য। চন্দ্রনাথ হেসে উঠল।

খাতার আঘাত দিয়ে চন্দ্রনাথ বোলতাটাকে ঘর থেকে বাহির করে দিলে, তারপরনিজেও বাহিরে গেল।

বালীগঞ্জ-পাড়ায় এক সিনিয়র ব্যারিস্টারের বাড়ীতে কন্‌সাল্‌টেশন্ সেরে সুপ্রকাশমোটরগাড়ি নিয়ে বাহির হল। সোফারকে ছুটি দিয়েছিল। নিজেই চালিয়ে চলেছে।

নতুন ভক্সহল্ গাড়ি ঝক্‌ঝক্ করছে। চালিয়ে আরাম আছে বটে কিন্তু একটা তেজী বড় ঘোড়ার লাগাম টেনে হাঁকিয়ে যাওয়ার মধ্যে যে পৌরুষ আছে, এ সুবৃহৎ গাড়ি চালিয়ে তা অনুভব করা যায় না। মোটর-চালক যন্ত্রচালক মাত্র; প্রাণের গতিময় খুশিভরা কোন প্রাণীকে আপন ইচ্ছামত চালনা করার আনন্দ বোধ হয় অন্যরূপ।

এই কথা ভাবতে ভাবতে সুপ্রকাশ ধীরে মোটরগাড়ি চালাচ্ছিল। তার মাথায় আজনানা চিন্তা ভিড় করেছে। জোরে গাড়ি চালাতে ইচ্ছা করছিল না।

বালীগঞ্জ ছাড়িয়ে গড়িয়াহাটা দিয়ে সুপ্রকাশ একটা রাস্তার মোড়ে এসে পড়ল।

দেখলে মোড়ের কাছে খুব রৌদ্রে চন্দ্রনাথ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ শুষ্ক, চুলগুলি আঁচড়ানো নয়, এ তার স্বাভাবিক রূপ নয়। সে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে এই জনস্রোত, প্রবহমান জীবনধারা হতে পৃথক, স্বতন্ত্র। যেন সে অসম্বন্ধ দ্রষ্টা।

সুপ্রকাশ মোটর গাড়ি এক পাশে রেখে থামিয়ে নামল।

হঠাৎ একটা বৃহৎ মোটর গাড়ি সম্মুখে এসে দাঁড়াতে চন্দ্রনাথ চমকে উঠল।সুপ্রকাশকে সে দেখেনি।

সুপ্রকাশ ধীর স্বরে বললে, নমস্কার চন্দ্রনাথবাবু!

—ও আপনি, ব্যারিস্টার সাহেব! এ আপনার মোটর গাড়ি! চমৎকার দেখতে, বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক মানুষের অদ্ভুত সৃষ্টি বটে! বেশ তো হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন—

—আপনি এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে যে?

—এ প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্যে যদি অমন সুন্দর মোটর গাড়ি থেকে নেমেথাকেন, তাহলে বৃথাই নামলেন।

—না না, আপনাকে দেখে নামলুম।

—দেখুন, এ রাস্তা দিয়ে ট্রাম যায় না যে বলবো ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। বাসবোধ হয় যায়, কিন্তু এটা বাস থামবারও জায়গা নয়। সুতরাং বলতে হচ্ছে, চলতেচলতে এখানে থেমে গেছলুম।

—আপনার শরীর কি ভাল নেই? কেমন শুকনো দেখাচ্ছে?

—বোধ হয় চিন্তায়। ভাববেন না, নিজের চিন্তায়। আমার এক নায়িকাকে নিয়ে বড়ই মুশকিলে পড়েছি—

—তাই কি পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, যদি মুশকিল-আসান আসে?

—ঠিক বলেছেন, এই রকম মোটর হাঁকিয়ে এসে কেউ যদি তাকে পথ হতে তুলেনিয়ে চলে যায়—

—তাহলে ভালই তো হয়, আমি আপনার নায়িকাকে যেখানে বলেন নিয়ে যেতেপারি, এ গাড়ি আপনার ডিস্‌পোজালে!

চন্দ্রনাথ স্থির চক্ষে সুপ্রকাশের দিকে চাইলে। সে চাউনিতে কৌতুকের ইশারা নেই, রুক্ষ করুণ দৃষ্টি।

সুপ্রকাশ অপ্রতিভ হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথ বললে, দেখুন, আপনার সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল; আপনার বাড়িতেএকবার যাব ভাবছিলুম।

—সে তো সৌভাগ্যের কথা। যদি সময় থাকে ও আপত্তি না থাকে এখনই চলুন—আমার আজ আর বিশেষ কাজ নেই।

—কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের মত ধনী লোকদের বাড়িতে অকারণেযেতে সংকোচ হয়। এক সময় ছিল, যখন আমাদের দেশের লক্ষ্মীর বরপুত্রেরাসরস্বতীর দীন সেবকদের পৃষ্ঠপোষক, সহায় ছিলেন। এখন জনসাধারণের কাছ হতেইলেখকদের অর্থলাভ ও সম্মান।

—এ আপনার ভুল ধারণা। আপনি জানেন না, আমি আপনাকে কত শ্রদ্ধা করি।আর আমার বোন তো আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা। আপনি আমার বাড়ি আসলেসে বড় আহ্লাদিত হবে। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করছি, যদি আজ আসা সুবিধে নাহয়, বলুন কবে—

চন্দ্রনাথ হেসে উঠল, কিন্তু সে হাসি ম্লান।

—বা, আমার ভক্ত পাঠিকা আপনাদের বাড়িতে রয়েছেন, আর আপনি কিন্তুবলেননি এতদিন—বলুন তো আজও দু'চার জনের নাম, আপনাদের সার্কেলেরআমি কি অভিজাত সম্প্রদায়ের লেখক হয়ে উঠলুম?

—না, আপনার ঠাট্টা রাখুন, আমি সত্যি বলছি।

—আপনাকে এ রকম দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই না। উঠুন আপনার গাড়িতে!

—আপনিও আসুন।

—দেখুন, বর্তমান যুগের সভ্য সমাজে এখন দুটি জাতি-বিভাগ, যাদের মোটর কারআছে ও যাদের মোটর- কার নেই। যাদের মোটর কার নেই তারা যখন পথ দিয়ে চলে, আর তাদের সামনে, পিছনে, পাশ দিয়ে মোটর-গাড়িগুলি ধূলি উড়িয়ে কানের কাছেহর্ন বাজিয়ে মত্ত গর্বে চলে যায়, তখন তারা কি ভাবে, সে কথা আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে কিছু বুঝতে পারছিলুম, মনে হয়। এখন মোটরগাড়িতে চড়ে গেলে এই পদাতিকদের সম্বন্ধে কি ধারণা হয়, সেটা বোঝবার যখন একটা সুযোগ পাওয়াযাচ্ছে—একটু রূঢ়ভাবে বোধ হয় বলে ফেল্লুম—কিছু মনে করবেন না—এটা একটাবিচ্ছিন্ন সামাজিক স্তরের অভিজ্ঞতারূপে—

—না, না, আমি কিছু মনে করছি না, শীগ্‌গির উঠে পড়ুন গাড়িতে। তা না হলেপথের ধুলো আরও খেতে হবে। ওই সব আসছে।

দু'জনে গাড়িতে উঠে বসল।

চন্দ্রনাথ বললে, না, ঘোরাবেন না গাড়ি। সোজাই চলুন। আমি আর একদিনআপনার বাড়িতে যাব। আমাকে কিছুদূর আগে নামিয়ে দেবেন, আমি হাঁটতেইবেরিয়েছি।

সুপ্রকাশ গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে। গাড়ি ছুটল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে।

দু'জনে স্তব্ধ। গাড়ি ছুটে চলেছে, ইঞ্জিনের শব্দ নেই।

কিছুদূর সোজা গিয়ে সুপ্রকাশ ডান দিকে এক রাস্তায় বেঁকে আলিপুরের দিকেচলল।

চন্দ্রনাথ ধীরে বলল, ঊর্মিলার সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়েছিল?

ঊর্মিলা! সকাল থেকে তার কথা বার বার সুপ্রকাশের মনে পড়েছে। তার কাছে যাবার প্রবল ইচ্ছা দমন করবার জন্যই সে এখন মোটরগাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সামনে একটা গরুরগাড়ি এসে পড়াতে সুপ্রকাশ গাড়ি থামাতে চেষ্টা করলে। প্রচণ্ডশব্দ করে গাড়ি থেমে গেল।

আবার গাড়ি চালিয়ে সুপ্রকাশ বললে, তার সঙ্গে আমার কালই তো দেখা হয়েছিল। আপনি বহুদিন যাননি শুনলুম।

—না।

—আচ্ছা, আপনি কি ঊর্মিলার ভাই হন, মানে দূর সম্পর্কের

—না, মোটেই না, গ্রাম-সম্পর্কেও না।

—কি জানি, এ ধারণা আমার কোথা থেকে হল! ঊর্মিলার গার্ডিয়ন কে আমায়বলতে পারেন—মানে—

—আমি নই এটা ঠিক।

—না, আপনি নন তা বুঝতেই পাচ্ছি।

—বোধ হয় এখন কেউ নেই, পোস্টটা খালি আছে, অ্যাপ্লাই করতে পারেন।

সুপ্রকাশ কোন উত্তর দিলে না। এ পরিহাসের বিষয় নয়। গাড়ির গতি সে আরওবাড়িয়ে দিলে। আলিপুর পার হয়ে তারা রসা রোডের কাছে এসে পড়লো।

চন্দ্রনাথ বললে, যদিও আমি তার গার্জেন নই, ঊর্মিলার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথাআমি ভাবি।

বিস্মিত নেত্রে সুপ্রকাশ চন্দ্রনাথের দিকে চাইলে।

চন্দ্রনাথ বলে চলল, দেখুন ব্যারিস্টার সাহেব, ঊর্মিলা আপনাদের অ্যারিস্টোক্রাটিকসমাজের মেয়ে নয়, আপনাদের ক্লাসের স্মার্ট সেটের নয়, আমরা নেহাত মধ্যবিত্ত,একথা কি আপনি ভেবেছেন?

—না, সে রকম ভাবে ভাবিনি।

—আপনি ঊর্মিলাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন, তার চোখে ধাঁধা লেগেছে।

—আমি?

—হ্যাঁ, এই ঝক্‌ঝকে মোটর কারে আপনার পাশে সে যখন বসে, তখন তারমুখের জ্বলজ্বলে ভাব দেখেছি। তার মনও ছুটে চলে—

—দেখুন আমি এরকম তো কোন কথা বলিনি, কোন ভাব দেখাইনি—

—সেই তো বলছি, আপনার কাছে যা নিছক ফ্লার্টিং, একটু—

—আমি এরকম ভাবে ভাবিনি।

—তা জানি, আপনাদের সমাজে—সেদিন ডাক্তার সাহেব নিয়ে গেছলেনঅঞ্জলিদেবীকে তাঁর গাড়িতে বনগাঁতে—

—না, না, আপনি ভুল বুঝছেন।

—আপনি ডাক্তার সাহেবের মত হঠাৎ "প্রপোজ" করবেন না জানি—

—সত্যি, আমি ব্যাপারটা এরকম ভাবে দেখিনি—

—কিন্তু সংসারের সাধারণ লোকে, সমাজের লোকে দেখতে পারে—মেলামেশা—

—আমি কি কোন অন্যায় কাজ করে ফেলেছি, আমি ক্ষমা চাইব গিয়ে—

—আপনি সত্যই যদি—

—দেখুন, এখন আমি এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারছি না, আমি ভাবব—

—ভাল করে ভাববেন। আপনি যদি ঊর্মিলাকে বিবাহ করতে চান, আমরা খুবইআনন্দিত হব। কিন্তু তা যদি না হয়, শুধু—

—না, না, আমি জীবন সম্বন্ধে সিরিয়াস ভাবে ভাবি, আমি অত হালকা—

—তা জানি বলেই আপনাকে বলছি, অনধিকার চর্চা মনে করবেন না।

—থ্যাঙ্কস্, মেনি থ্যাঙ্কস্; আপনি একটা নতুন আলো আনলেন—

দুজনে আবার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গাড়ি বেগে চলেছে।

তারা টালিগঞ্জের পোল পেরিয়ে এল।

চন্দ্রনাথ বললে, এইখানে আমায় নামিয়ে দিন।

—এখান থেকে তো আপনার বাড়ি দূর হবে, চলুন আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়েআসি।

—না, আমি এখন বাড়ি যাব না। আরো আমি একটু হাঁটতে চাই।

—কবে আসবেন বলুন, আমাদের বাড়ি?

—আসছে সপ্তাহে যে দিন বলবেন। এইখানেই থামান। না না, আপনি নামছেন কেন? নমস্কার।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল।

সুপ্রকাশ আবার বেগে মোটরগাড়ি চালিয়ে দিলে। ট্রাম-বাস-গাড়িসংকুল জনবহুলকলিকাতার পথে সে এসে পড়েছে, কিন্তু মোটর গাড়ীর গতিবেগ কিছু কমালো না।

ঊর্মিলার কাছে গেলে কেমন হয়?

একটা বোঝাপড়া করা দরকার।

আগে সে নিজে স্থিরচিত্তে ভাবতে চায়। আজ দেখা না করাই ভাল।

আজ তার চিত্ত চঞ্চল, চিন্তার সূত্র বার বার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

কেমন একটা বেদনা মনে হয় বুকে। ধনীর গৃহে তার জন্ম হয়েছে, সেজন্য সেত্যাজ্য হবে?

সামনের পথটা মনে হচ্ছে নাট্যমঞ্চের রঙীন দৃশ্যের মত অলীক।

একটা সাইকেল পাশ দিয়ে বেগে চলেছে। তার গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রায় সামনে এসে পড়ছে।

পেছনে ভীষণ শব্দ। একটা লোহার পাত বোঝাই লরী ও একটা মোটর বাস প্রচণ্ডবেগে আসছে।

সুপ্রকাশের কানে কিন্তু তাদের আসার শব্দ পৌঁছাচ্ছিল না। কলের পুতুলের মতসে স্থির হয়ে বসে বেগে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। তার মাথার ভেতর চিন্তাজগতের চঞ্চলমূর্তিগুলির সঙ্গে চক্ষের সম্মুখে পথের চলন্ত বস্তুপুঞ্জের কোন যোগ ছিল না।

সাইকেল-চালক একেবারে তার গাড়ির সম্মুখে এসে পড়েছে, এঁকেবেঁকে চলেছে।লোকটা পাগল নাকি? গাড়িটা আরও বাঁ পাশ দিয়ে চালিয়ে বের করে নিলে হয়।

গতি না কমিয়েই সুপ্রকাশ সাইকেল-চালককে বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি একটু বেঁকালে বাঁ দিকে। তার হাত কাঁপছে। চোখে যেন ঠিক দেখতে পাচ্ছে না।

পেছন থেকে কে যেন খুব জোরে ধাক্কা মারলে।

প্রচণ্ড শব্দ!

জোরে সুপ্রকাশ ব্রেক টানলে। সে কি করছে, কেন করছে, নিজে বুঝতে পারছেনা।সমস্ত গাড়ি কেঁপে নেচে উঠল।

কে যেন বুকে হাতুড়ি মারলে।

তারপর অন্ধকার...অন্ধকার...

সব চেতনা লুপ্ত।

জীবনের স্পন্দন রয়েছে, কোন অনুভূতি নাই।

পিছনের লরী-চালকও প্রাণপণ জোরে ব্রেক টেনে তার গাড়ি থামিয়েছে। ঝন্‌ঝন্‌শব্দে কতকগুলি লোহার পাত পথে পড়ে গেছে।

চারিদিকে হৈ রৈ, ভিড়, চিৎকার!

এই শব্দ-সমুদ্রের মত্ত কলরোলে সুপ্রকাশের রক্তাক্ত মুখে কোন কথা নেই, চোখে কোন দৃষ্টি-বোধ নেই। চিন্তার ঘন অরণ্যে দিশাহারা হয়ে চেতনার বিলোপনই যেন সে চেয়েছিল।

চন্দ্রনাথ সুপ্রকাশের কাছে বিদায় নিয়ে গড়িয়াহাটা রোড বেয়ে একমনে চললো।

এখনও ঊর্মিলার চিন্তা তার মন থেকে দূর হয়নি। সুপ্রকাশের সঙ্গে হঠাৎ দেখাহওয়াতে সেই চিন্তাই আবার নতুন করে তার মনে এল।

খুলনার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লো—সেই জীবনের অরুণোদয়, পাখিডাকা প্রভাত—শিশির-সিক্ত তাজা দণ্ড প্রহরগুলি—এই সুপ্রকাশ তখন কোথায় ছিল?

সামনে পড়লো বড় একটা মাঠ। মাঠের ওধারে অনেকগুলো নতুন বাড়ি হচ্ছে—

একটা আঁকাবাঁকা শিমুল গাছ। শিমুল-তলাটায় অনেক কাঠের গুঁড়ি পড়ে আছে।চন্দ্রনাথ একটার ওপর এসে বসলো।

সুপ্রকাশকে দেখে পর্যন্ত ওর মনে একটা চিন্তা এসেচে। ঊর্মিলাকে সে নিজে যতই ভালবাসুক, হয়তোসুখী সে করতে পারবে না, চন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছলনয়।

তার চেয়ে যদি সুপ্রকাশের সঙ্গে তার—

খুব মহৎ চিন্তা। কিন্তু সব মহৎ চিন্তাই বড় দুঃখ-দায়ক। ঊর্মিলাও তাই চেয়ে থাকেমনে মনে? স্বাভাবিক বটে ঊর্মিলার পক্ষে। সুপ্রকাশকে এইমাত্র সে কথাটা বলেচে।পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ঊর্মিলা, ঐশ্বর্য যে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে এআর বিচিত্র কি?

এখনই একবার সে ঊর্মিলার কাছে যাবে।

তার সঙ্গে বিশেষ জরুরী কথা আছে চন্দ্রনাথের।

ঊর্মিলার মনের ভাবটা একবার ভাল করে জানা দরকার। তার চেয়েও ভাল ভাবে জানা দরকার বড়লোকের ছেলে সুপ্রকাশ ঊর্মিলাকে নিয়ে খেলা করতে চায়, না সত্যিই তাকে বিয়ে করতে চায়!

সেদিন সন্ধ্যায় ঊর্মিলার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে চন্দ্রনাথ উঠে ওর ঘরের দোর পর্যন্তএসে থম্‌কে দাঁড়ালো।

ঊর্মিলার ঘরের মধ্যে আলো নেই। অথচ মনে হোল সে কোথাও বেরোয়নি, ঘরের মধ্যেই আছে। অসুখ-বিসুখ হয়েছে নাকি?

দোরে কড়া নাড়তেই ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে বললে—কাকে চান?

—মাইজি আছেন?

—তাঁর শরীর খারাপ। আপনার নাম কি? বলে আসি বাবু।

ঝি চলে গেল। এটি নতুন ঝি, চন্দ্রনাথ একে কোনদিন দেখেনি।

একটু পরে ঝি ফিরে এসে বললে, আসুন বাবু!

ঊর্মিলা ওদিকের বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে। মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। সামনে একটা ছোট টেবিলে দু'একটা ওষুধের শিশি।

ম্লান হেসে ঊর্মিলা বললে, আসুন চন্দ্রনাথবাবু। বসুন, চেয়ারটা টেনে নিন্।

—একি ঊর্মিলা দেবী! কি হয়েছে আপনার?

—সংঘাতিক মাথা ধরেছে দুপুর থেকে। স্কুলে যাইনি, কোথাও বেরুইনি। আপনিএসেচেন ভাল হোল, একা একা কি খারাপ লাগছিল আজ সারাদিন।

—আমারও একা আজ সারাদিন খারাপ লাগছিল—তাই গড়িয়াহাটা রোড ধরে বেড়াতে বার হয়েছিলুম—

—কত দূর গিয়েছিলেন?

—বেশিদূর পায়ে হেঁটে যেতে হয়নি।সুপ্রকাশবাবুর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁরইমোটরে—

ঊর্মিলা কেমন যেন চমকে উঠে বললে—সুপ্রকাশবাবু?

তার গণ্ডদেশ যেন ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠলো। ঊর্মিলার ভাবপরিবর্তন চন্দ্রনাথেরচোখ এড়ালো না। তার মনে কোথায় একটা কাঁটা যেন বিঁধলো খচ্ করে। সে বললে—হ্যাঁ, উনি আমায় উঠিয়ে নিলেন। তারপর দুজনে কথা কইতে কইতে আসছিলাম।আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

ঊর্মিলা চুপ করে রইল।

চন্দ্রনাথ সাহিত্যিক লোক, সে নারীর মন নিয়ে অনেক উপন্যাস লিখেছে। ঊর্মিলারএই নীরবতা এ সময়ে—এ লক্ষণ ভালো নয়। এর চেয়ে যদি ঊর্মিলা সহজভাবেজিগ্যেস করতো, সুপ্রকাশবাবুর সঙ্গে কি কথা হোল? তাহলে চন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হোত—অন্তত মনে এসব বেদনা পাওয়ার কারণ ঘটতো না তাতে।

চন্দ্রনাথ মরীয়া হয়ে উঠেচে তখন।

সে শেষ পর্যন্ত দেখবে, সুপ্রকাশের প্রতি ঊর্মিলার মনোভাব কি রকম! অনুমান নয়, সে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চায় আজ।

বললে—বেশ লোকটি সুপ্রকাশবাবু।

ঊর্মিলা উদাসীন ভাবে বললে—হ্যাঁ,বেশ লোক।

আর কিছু না। এইটুকুতেই শেষ।

চন্দ্রনাথ শঙ্কিত হোল—সুপ্রকাশের সম্বন্ধে ঊর্মিলার মনোভাব কি এত গভীর।

বেদনায় তার মনটা টন্‌টন্ করে উঠলো।

এই ঊর্মিলা তার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন।

একে নিয়ে জীবনের কত অলস মুহূর্তে কত জাল বুনেচে কারণে-অকারণে।

খুলনার সেই দিনগুলি...বালিকা ঊর্মিলা...

ঊর্মিলা সুপ্রকাশের প্রতি অনুরক্ত তাহলে সত্যিই?

গভীরভাবেই অনুরক্ত?

সে দেখলে সুপ্রকাশের সম্বন্ধে কোনো কথা তুলে লাভ নেই। ঊর্মিলা তার কথাতেযোগ দিতে পারবে না। তবুও আজ সে শেষ পর্যন্ত না দেখে যাবে না। কথাটা আরএকটু ঘুরিয়ে পাড়তে হবে।

চন্দ্রনাথ বললে—ঊর্মিলা দেবী, খুলনার কথা মনে পড়ে?

ঊর্মিলা হেসে বললে—খুব পড়ে। কেন পড়বে না?

—সেদিনে আর এদিনে কত তফাৎ হয়ে গিয়েচে, এ আপনার মনে হয় না?

—নিশ্চয় হয়। তখন জগৎটাকে অন্য চোখে দেখতুম, এখন দেখি অন্য চোখে।

কিন্তু ঊর্মিলার কথার জবাবের দিকে চন্দ্রনাথ মন দিলে না। বাল্যদিনের ছবি তারমনে উঠতেই ওর মন চলে গেছে খুলনার সেই নদীতীর, সেই স্টীমারঘাটা, ওপারের সেই বনবাগানের সারি, বাল্যজগতের সেই মায়ালোক—সে সবের মধ্যে।

চন্দ্রনাথ ভুলে গেল কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেচে, ভুলে গেল সুপ্রকাশের সম্বন্ধে ঊর্মিলার মনোভাবটা ভালো করে জানাই আজ তার এখানে আসবার প্রধান উদ্দেশ্য। অকারণে ঊর্মিলার প্রতি এক অদ্ভুত স্নেহে তার মন বিগলিত হয়ে উঠলো।

সে বললে—মাঞ্জা-দেওয়া ঘুড়ির সুতোয় আপনার সেই আঙুল কাটার কথা মনেপড়ে?

একথা সেদিন চিঠিতে সে লিখেছিল—কিন্তু চিঠিখানা পাঠাতে সেদিন বাধা ছিল, কেন তা কে জানে।

চিঠির কথাগুলো আজ সে মুখে বলবে।

ঊর্মিলা কিন্তু ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে জানলার বাইরে পোড়োজমিটার দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রনাথ দেখলে সে কি ভাবছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চন্দ্রনাথ আবার বললে—কি ভাবছেন বলুন তো?

ঊর্মিলা ওর দিকে চাইলে। তারপর ইজিচেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললে—বসুন আপনি। আসচি, এক মিনিট—চায়ের কথা বলে আসি।

—ওকি? আপনার এই অসুখ শরীর নিয়ে—বসুন, চায়ের দরকার নেই।

—আসচি আমি।

একটু পরে ঊর্মিলা এসে আবার ইজিচেয়ারে বসলো, তখন সে চোখে মুখে জলদিয়ে এসেছে, মাথার চুলে চিরুনি দিয়ে সামনের আলুথালু ভাবটা দূর করেচে। তারসে অন্যমনস্ক ভাবটাও যেন আর নেই।

আসন গ্রহণ করে সে এবার নিজেই বললে—খুলনার কথা মনে হয় প্রায়ই।বিশেষ যখন এমনিতরো একা একা থাকি। ঘুড়ির সুতোয় আঙুল কেটে যাওয়ার কথা বলছিলেন—সে কি কোনোদিন ভুলে যাওয়ার কথা?

—মনে পড়ে তা হোলে?

নিশ্চয়ই।

—আর কি মনে পড়ে?

—এক বুড়ি থাকতো আমাদের বাসার কাছে। ছোলার পাটালি বিক্রি করতো।একবার আপনি ওর কাছে ধারে পাটালি কিনলেন—

—মনে পড়েচে! বুড়ি কিছুতেই দেবে না, আমার সঙ্গে বাসা পর্যন্ত আসতে চায়— বাবাকে বলে দেবে বলে। তুমি—আপনি আঁচল থেকে খুলে ওর দাম মিটিয়ে দিলেন।

—আঁটুলির কথা মনে আছে?

—খুব আছে। কিরণবাবু ওভারসিয়ারের মেয়ে— আমাদের সঙ্গে খেলতো। লম্বা, রোগা চেহারা, খুব বড় বড় চোখ—ভারি লাজুক। আহা, মারা গেল বেচারী!

—আমিই কেবল বেঁচে রইলুম কষ্ট পেতে, কি বলেন?

চন্দ্রনাথ একথার কোনো উত্তর দিলে না। এই সময় ঝি চা করে নিয়ে এল। ঊর্মিলাইজিচেয়ার থেকে উঠে চা ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

খোলা জমিটার দিক থেকে হু হু হাওয়া বইচে। আজ রাতটা চন্দ্রনাথের বড় সুন্দরলাগছিল। এই সব রাত্রি যে অনির্দেশ্য আনন্দের ইঙ্গিত বহন করে আনে মনে—রাত্রিকেটে গেলে দিবসের রূঢ় সূর্যালোকে তার মিথ্যার দিকটা যদি ধরা না পড়তো!

সে চা খেতে খেতে বললে—দেখুন একদিন আপনার মুখে একটি গান শুনবো। আমার এই প্রার্থনা আপনাকে কিন্তু পূর্ণ করতে হবে।

ঊর্মিলা হেসে বললে—গান শুনবেন সুমিত্রার কাছে। আমি করি শুকনো ইস্কুল-মাস্টারি। মেয়েদের শেখাই সিকোয়েন্স অফ্ টেন্সেস, ইতিহাসের সন তারিখ। আমার কাছে গান শুনবেন? এক আধটা আবৃত্তি বরং যদি শুনতে চান, শোনাতে পারি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ওঃ, চমৎকার হবে সে। তবে আজ আপনাকে বিরক্ত করবো না, আপনার শরীর আজ অসুস্থ—আজ থাক্।

—তাতে কি? আস্তে আস্তে শোনাবো এখন। চা আর এক পেয়ালা?

—না না, আর চা নয়। আবৃত্তিও আজ নয়—আপনার মাথার ব্যথা—আজ আবৃত্তি থাক গে। বই পড়বেন না মুখস্থ বলবেন?

—আপনি যে রকম শুনতে চান। মুখস্থও আছে, পড়ে শোনাতেও পারি।

চন্দ্রনাথ একটু আশ্চর্য না হয়ে পারলে না, ঊর্মিলার কাছ থেকে এত মধুর ব্যবহারসে কোন দিন পায়নি। ঊর্মিলাকে কেন জানি না একটু গর্বিতা বলে মনে হয়েচে ওর আজকালকার ব্যবহারে। নারী একেই রহস্যময়ী, রূপসী নারীর চরিত্র আরও রহস্যময়ী।

চন্দ্রনাথ একটা কথা জানে, নারীর রূপ তাকে পুরুষের কাছে যতটা রহস্যময়ী করে তোলে, তার অন্তঃপ্রকৃতির সম্যক পরিচিতি হয়তো ততটা নয়। পুরুষে কিন্তু তাতেই মুগ্ধ হয়, প্রলুব্ধ হয়, দিশাহারা হয়। রূপসী ঊর্মিলা তার মনে আজ রাত্রে অতর্কিতে মোহের সৃষ্টি করচে তার চোখে রঙীন নেশা ধরিয়ে দিতে চাইচে।

আর সে এখানে বেশিক্ষণ থাকবে না।

রাত অনেক না হলেও ন'টা বোধ হয় বাজে। এবার যাওয়াই ভালো।

ঊর্মিলা নিজে উঠে গিয়ে একখানা রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' নিয়ে এল। পাতা খুলে খুলে পড়ে দেখতে যাচ্চে, এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হোল। ঊর্মিলা ডেকে বললে—ঝি, দোর খুলে দেখ কে ডাকে। বোধহয় বাড়িওয়ালার লোক। ওর এসময় ভিন্ন সময় হয় না। বলে দিয়েচি কতদিন যে এ সময়ে—

কিন্তু একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বাড়িওয়ালার কর্মচারী নয়—সুমিত্রাদের চাকর দৈতারি। সে এসে ঊর্মিলার উদ্দেশে সেলাম করে বললে—দিদিমণি চিঠ্ঠি ভেজিন্।

দৈতারির হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে ঊর্মিলার মুখ চোখ কেমন হয়ে গেল—ওর হাত পা যেন থরথর করে কাঁপছে বলে মনে হোল চন্দ্রনাথের।

সে বিস্ময় ও উদ্বেগের সুরে বললে— কি হোল আপনার?

ঊর্মিলা কোন কথা না বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

ছোট্ট চিঠিখানা। তাতে লেখা আছে :—

ভাই ঊর্মিলা,

এই মাত্র ফোন্ পেলাম সুপ্রকাশবাবু মোটর অ্যাকসিডেন্টে গুরুতর আহত হয়েমেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সিতে গিয়েচেন। মেডিকেল কলেজের ডাক্তার পাল ওঁকেচেনেন, আমাদেরও চেনেন। তিনিই ফোন্ করছেন। আমি সেখানে যাচ্চি, তুমিও এসো।

সুমিত্রা

চন্দ্রনাথের হাত থেকে চিঠিখানা পড়ে গেল। দুজনেই যেন কিছুক্ষণ আড়ষ্ট।অবশেষে চন্দ্রনাথ বলে উঠলো— সে কি! এই তো আজ আমি সুপ্রকাশবাবুর মোটরেগড়িয়াহাটা রোডে উঠে বালিগঞ্জে এলাম।

ঊর্মিলা ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে—ওঁর মোটরে?

—হ্যাঁ—এই তোকি আশ্চর্য!

ঊর্মিলা হঠাৎ ধড়মড় করে ইজিচেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললে, দাঁড়ান আমিআসচি। চলুন আমরা এক্ষুনি যাই।

—আমি ততক্ষণ একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনি।

দশমিনিটের মধ্যে চন্দ্রনাথ ট্যাক্সি এনে হাজির করলে। তারপর দুজনে বেরিয়ে পড়লো মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে। পথে চন্দ্রনাথ একবার ঊর্মিলার দিকে চেয়েদেখলে, ঊর্মিলার মুখে যেন রক্ত নেই। সে শরীর এলিয়ে দিয়ে ট্যাক্সির সিটে প্রায় শুয়ে পড়েচে। মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত সারাপথে চন্দ্রনাথ তার মুখে একটা কথাও শুনলেনা।

মেডিকেল কলেজে চন্দ্রনাথ ঊর্মিলার হাতধরে নামলে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়েদিয়ে ওরা দুজনে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকতেই সর্বপ্রথম ওদের সঙ্গে দেখা হল শিবপ্রসাদের সঙ্গে। শিবপ্রসাদ ঊর্মিলাকে দেখে এগিয়ে এসে দুহাত জুড়ে নমস্কারকরতে করতে বললে—আসুন, আসুন, খবর পেয়েচেন আপনি। শুনুন সুমিত্রা দেবীরকাছে।

চন্দ্রনাথকে শিবপ্রসাদ দেখেও যেন দেখলে না।

ঊর্মিলা ব্যস্ত ভাবে বললে—এখন উনি আছেন কেমন?

—অনেকটা ভালো। আসুন আমার সঙ্গে—

চন্দ্রনাথ ও ঊর্মিলা এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সরু করিডর অতিক্রম করে ছোট হলটায় ঢুকলো। হলের এক কোণে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে যে বিছানা, তাতেই সুপ্রকাশকেশুইয়ে রাখা হয়েচে। দেখে মনে হল সুপ্রকাশের জ্ঞান নেই।

ঊর্মিলার প্রথমই চোখে পড়লো, সুমিত্রা সুপ্রকাশের মাথার কাছটিতে বসে। আরওকয়েকজন অপরিচিতা মহিলা, চন্দ্রনাথ ও ঊর্মিলা এঁদের চেনে না, সম্ভবত সুপ্রকাশেরআত্মীয়া এঁরা। দুজন তরুণ যুবককেও দেখা গেল বিছানার অন্যদিকে। কেউ কোনোকথা বললেন না এঁদের দেখে।

ঊর্মিলা কেবল সুমিত্রার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে —কেমন আছেন এখন?

সুপ্রকাশের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা ও কপালটার দিকে দেখিয়ে সুমিত্রা বললে—অনেকটা ভালো। হার্ট বেশি হন্‌নি, তবে বড্ডশক্ লেগেছে। কিছুক্ষণ আগে একবারজ্ঞান হয়েছিল, ডাক্তার আমাদের সকলকে চলে যেতে বলেছেন। তোমার জন্যেইআমরা অপেক্ষা করচি।

ঊর্মিলার মনে মনে কেমন হিংসে হল। সুমিত্রা সুপ্রকাশের মাথার কাছে ঘেঁষে বসেআছে যেন কত বড় আপনার লোকটি! সে কেন আগে খবর পায়নি?পরক্ষণেই তারএকটা কথা মনে হল। সুমিত্রাকে বললে—একবার ডাক্তার পালের সঙ্গে দেখা করাযায় না এখন?

সুমিত্রা শিবপ্রসাদকে ডেকে বলতেই শিবপ্রসাদ জিগ্যেস্ করলে কেন বলুন তো? ডাক্তার পাল এখন নেই। যদি ডাক্তারি বিষয় কোনো কিছু জিগ্যেস্ করতে চান, তবেআমি নিজে তো হাজিরই আছি।

—এঁর অবস্থা এখন কেমন?

—ভাল বলেই মনে করি।

—বিপদ কেটেছে বলে মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। সে বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।

সুমিত্রা বললে—চন্দ্রনাথবাবু, আপনি কোথায় ছিলেন?

চন্দ্রনাথ সরে এসে নমস্কার করে বললে—আমার ইতিহাসটা একটু অদ্ভুত শোনাবে। আমি ঠিক বেলা পাঁচটার সময় সুপ্রকাশবাবুর মোটরে গড়িয়াহাটা রোডেবেড়িয়েচি।

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে বললে—আপনি! আজ পাঁচটার সময়!

—ঠিক তাই। ওখান থেকে ফিরে এসে ঊর্মিলাদেবীর সঙ্গে দেখা করি। বসে গল্প করছি, এমন সময় আপনার লোক গেল চিঠি নিয়ে।

—আপনাকে উনি নামিয়ে দিয়ে কোন্‌দিকে গেলেন তখন?

—কলকাতার দিকে চলে এলেন।

শরীর ভাল ছিল ওঁর?

—হ্যাঁ, বেশ কথাবার্তা বলছিলেন, আমি তো অন্তত কিছু খারাপ বুঝিনি।

সুমিত্রার এত কথাবার্তার মধ্যে ঊর্মিলা যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। সুমিত্রাইকি সব জেনে নিতে চায় সুপ্রকাশের সম্বন্ধে, তার নিজের জানবার বুঝি কিছু নেই?

ঊর্মিলা সহ্য করতে পারছে না হাসপাতালের এ আবহাওয়া। এখানে এসে পর্যন্ত সে দেখচে সুমিত্রাই এখানকার কর্ত্রী। এখানকার সব লোক, সুপ্রকাশের নিজের আত্মীয়স্বজন, ওকে এমন একটা আসনে বসিয়েচে যে আসন থেকে যত ইচ্ছে প্রশ্ন করেযেতে পারে, যত ইচ্ছে আদেশ চালাতে পারে, যার তার ওপর। হাসপাতালের নার্সগুলো পর্যন্ত যেন ওর মনকে উদ্বেগশূন্য করতে ব্যস্ত, ওকে খুশি রাখা যেন রোগীরপ্রতি ওদের দায়িত্বের একটা অংশ। আরও মিনিট কুড়ি কেটে গেল।

একটি তরুণী নার্স এসে সুমিত্রাকে কি বললে।

সুমিত্রা বললে—দরকার হয় থাকতে হবে। ডাক্তার পাল যা বলেন।

ঊর্মিলা জিগ্যেস করলে—নার্স কি বলছিল?

—বললে, রাত্রে আপনারা কেউ কি হাসপাতালে থাকবেন?

—যদি দরকার হয়, আমি থাকতে পারি। আমায় জানিও সুমিত্রা।

শিবপ্রসাদ বললে—কারো থাকবার দরকার হবে না বোধ হচ্ছে। তবুও ডাক্তারপাল এলে একবার জিগ্যেস করবো।

আরও আধঘণ্টা কাটলো।

নার্স এসে জানালে, এবার সবাইকে চলেযেতে হবে।

চন্দ্রনাথ বললে—ঊর্মিলা দেবী, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো কি?

ঊর্মিলার মন ভাল নয়, সুমিত্রা এখানে কর্ত্রী, ও এখানে গাড়ির পঞ্চম চক্রের মতইঅনাবশ্যক—মিছামিছি রাত জেগে বসে থেকে এখানে লাভ কি?

ঊর্মিলা এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চন্দ্রনাথের সঙ্গে বাইরে এসে ট্যাক্সিতেচড়লো।

চন্দ্রনাথ দেখলে ঊর্মিলা অন্যমনস্ক। যেন কি একটা ভাবচে সে, ভেবে কিছুতেইমীমাংসা করতে পারচে না।

চন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলে—বাড়ি যাবেন সোজা তো?

—একটু মাঠের দিকে ঘুরে যাওয়া যাক্, চলুন। হাসপাতালের হাওয়ার পরে—

কার্জন পার্কের কাছ দিয়ে যাবার সময় ঊর্মিলাই বললে—আসুন এখানে একটু ফাঁকায় বসা যাক্।

চন্দ্রনাথ বললে—বসতে যদি হয় তবে চলুন রেড্ রোড দিয়ে গিয়ে লর্ড রবার্ট-এর স্ট্যাচুর তলায় বসি।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে গিয়ে সেখানে পৌঁছাল। রাত একটু বেশী হয়েচে, মাঠ ওপাশের পথগুলি জনশূন্য। শীত কমে গিয়েচে, বেশ দক্ষিণা হাওয়া বইচে মাঠের মধ্যে।

ঊর্মিলা বললে—আচ্ছা চন্দ্রনাথবাবু, আপনি তো অনেক কথা ভাবেন, অনেক কিছু পড়েচেন—একটা কথার জবাব দিন তো?

—কি বলুন?

—পৃথিবীতে আমরা কি স্বাভাবিক বন্ধুর দল নিয়ে জন্মাই?

—একথার মানে বুঝলুম না।

—বুঝলেন না কেন? আত্মার আত্মীয়, সোল-এর এফিনিটি দেখলেই মনে হওয়াএ আমার কত কালের আত্মীয়—এই সব?

—আপনি কি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন?

—হয় তো।

—তা হোলে মরণের পরে জীবন আছে, এতেও বিশ্বাসবান?

—নিশ্চয়ই।

—তবে তো আপনি সব সমস্যার মীমাংসা করে ফেলেচেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তবে আর আমাকে জিগ্যেস করচেন কেন?

ঊর্মিলাবললে—মীমাংসা এখনও হয়নি বলেই তো জিগ্যেস করচি।

—যদি বলি আপনার কথাই ঠিক! স্বাভাবিক বন্ধু নিয়েই মানুষ জন্মায়!

—আমারও তাই মনে হয়েচে।

—কথাটা কি আজ মনে এসেচে ঊর্মিলা দেবী?

ঊর্মিলা একথার কোনো উত্তর না দিয়ে দূরে গঙ্গাবক্ষে অবস্থিত একখানাআলোকোজ্জ্বল জাহাজের দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রনাথ আবার বললে—আমার কথার উত্তর দিলেন না যে!

ঊর্মিলার যেন চমক ভাঙলো। চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন যাই। রাত হয়েচে বটে।

ঊর্মিলার বাড়ির সামনে এসে চন্দ্রনাথ ঊর্মিলাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিছুদূরএসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে। আজ তার যেন মনে হয়েচে, ঊর্মিলা এতদিন তার প্রতি যেঔদাসীন্য দেখিয়ে এসেচে—আজ যেন ততটা ঔদাসীন্য তার সম্বন্ধে আর নেই ঊর্মিলার।

এ অদ্ভুত ধারণার কারণ কি সে কিছুই বলতে পারবে না, কিন্তু যে ভাবেই হোকএ ধারণা তার জন্মেছে।

চন্দ্রনাথ নামকরা সাহিত্যিক, মানুষের মন নিয়ে নড়াচাড়া করে হয় তো মানুষের মন বোঝবার দুর্লভ ক্ষমতা সে অর্জন করেছে। কিংবা এ তার জন্মগত শক্তি, সেই শক্তিরপ্রেরণাতেই আজ সে সাহিত্যিক হতে পেরেচে।

নিজের বাসায় এসে চন্দ্রনাথ আহারাদি শেষ করে শয্যাগ্রহণ করল। কিন্তু কত রাতপর্যন্ত তার ঘুম হোল না। ওই এক চিন্তা—ঊর্মিলার চিন্তা, তার দেহমন জুড়ে বসেআছে সব সময়। বিশেষ করে আজ তার অভীপ্সিতা দেবীর দুর্লভ সাহচর্যে এতক্ষণ যাপন করে এসে এমন অবস্থা তো হতেই পারে।

ঊর্মিলা আজ তাকে আর একটু বসতে বলেচে ময়দানে, তার সঙ্গে বেড়াতে চেয়েছে নিজে থেকেই।

কখনো তো এর আগে এমন হয়নি?

রাত্রে হাসপাতাল থেকে সুমিত্রা বাড়ি চলে এল।

ডাক্তার পাল বললেন, রাত্রে কারো সেখানে থাকবার দরকার নেই, রোগীর অবস্থাভালই।

শিবপ্রসাদ গাড়িতে সুমিত্রার সঙ্গে এল ওকে পৌঁছে দিতে। সুমিত্রার ইচ্ছে ছিল নাশিবপ্রসাদ ওর সঙ্গে আসে।

গাড়িতে উঠেই শিবপ্রসাদ বললে—ভালই হয়েছে। হাসপাতালে থাকতে হলেরাত্রে আপনার বড় কষ্ট হোত।

সুমিত্রা বললে—আমার কষ্টের জন্যে আমি তত ভাবচিনে। ধরুন যদি রাত্রেঅবস্থা খারাপ হতো তবে কি আমার কষ্ট ভেবে চুপ করে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকাচলতো?

শিবপ্রসাদের মুখ দেখে মনে হোল সুমিত্রার এ উত্তর তার ভাল লাগেনি। তার মনে ঈর্ষা জেগে উঠেচে। সুপ্রকাশের প্রতি সুমিত্রার এ পক্ষপাতিত্ব সে কোনোদিনই ভালচোখে দেখে না। আজ হাসপাতালের সুমিত্রার যে উদ্বেগ ও দরদ প্রকাশ পেয়েছেসুপ্রকাশের জন্য, সেটা সে নিজের চোখে দেখেচে। সেই থেকেই ওর মনে শান্তি নেই।

আজ সে যদি ওই রকম মোটর-চাপা পড়তো, সুমিত্রা কি তাকে দেখতেহাসপাতালে ছুটে যেত?

বন্ধুত্বের খাতিরে ছুটে গেলেও কি অমনতর দরদ দেখাতে পারতো তার প্রতি?

সারাপথ শিবপ্রসাদ আর কোনো কথা বলতে চেষ্টা করলে না সুমিত্রার সঙ্গে। সুমিত্রার মুখ দেখে সে মনে ভরসা পেলে না কথা কইবার। কেবল ওদের বাড়ির দোরে গাড়ি এলে সুমিত্রার নেমে যাবার সময় যে বললে, একটা কথা, কাল আপনি কখন হাসপাতালে যাবেন?

—বিকেলের দিকে। কেন বলুন তো?

—তা হলে আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাই।

—বেশ আসবেন, সাড়ে পাঁচটাতেই আসবেন।

শিবপ্রসাদের ফ্যাকাসে মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন সুমিত্রার এ উত্তরতার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সে বললে—সাড়ে পাঁচটার আগেই আসবো।আমারও কি কম দুর্ভাবনা সুপ্রকাশবাবুর জন্যে? কাল সারাদিন কাজকর্ম করতেপারবো না ঠিকমত। ভাল কথা, আপনার বাবা কেমন আছেন?

—থ্যাঙ্কস্, বাবা ভালই আছেন।

—হ্যার্টের সেই ব্যথাটা—

—কাল রাত্রে বেশ বেড়েছিল, এমন কি ডক্টর চৌধুরীকে একবার ডাকার দরকারও হয়েছিল, আজ সকাল থেকে সে সব কিছু নেই। ঘুমিয়েছেন সারাদিন।

শিবপ্রসাদ দু'একবার কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলে না। নমস্কার করেবিদায় নিলে।

সুমিত্রার কাছ থেকে চলে গিয়েই শিবপ্রসাদের মনে পড়লো অঞ্জলির কথা।

অঞ্জলির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করাটা বোধ হয় খুবই উচিত ছিল। সে অন্যায় করেচে। অঞ্জলির ওখানে একবার যাওয়াটা দরকার। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে অঞ্জলির মত মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলে, কিন্তু তাকে বিয়ে করা চলে না। শিবপ্রসাদের বিয়েসম্বন্ধে ধারণা অন্য রকম। যে মেয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে স্বর্ণযৌতুক বহন করে তার ঘরে উঠবে না, তাকে বিয়ে করতে শিবপ্রসাদ রাজি নয়।

অঞ্জলির অর্থ নেই।

খানিকটা রূপ আছে বটে, কিন্তু শিবপ্রসাদ রূপ জিনিসটাকে কোনো দিনই প্রাধান্যদিতে রাজি নয় বিবাহের ব্যাপারে।

সুমিত্রার কথা সে ভুলতে পারবে না কোনো মতেই।

ওই একটি মেয়ে—যাকে বিধাতা লক্ষ্মীর মত সকল ঐশ্বর্য দিয়ে পৃথিবীতেপাঠিয়েছেন। রূপ আছে, বুদ্ধি আছে, তেজ আছে।

সুমিত্রা সব দিক থেকে শিবপ্রসাদের উপযুক্ত বটে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েচে, তাতে সুমিত্রার সম্বন্ধে শিবপ্রসাদ তো আদৌ সাহস পায় না কোন-কিছু ভাবতে।

সুমিত্রার এ ধরনের মনোভাবের মূলে কে আছে, চন্দ্রনাথ না সুপ্রকাশ?

চন্দ্রনাথ বলেই শিবপ্রসাদের পূর্বে বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু ব্যাপার দেখে তার পূর্বধারণা খানিকটা বদলে গিয়েচে।

সুমিত্রা কি তবে সুপ্রকাশকে ভালবাসে?

যদি কেউ কাউকে ভাল না বাসে, তবে সে কি তার জন্যে অতটা উদ্বেগ দেখাতেপারে?

সুমিত্রা যা করেচে সুপ্রকাশের জন্যে, অত্যন্ত নিকট-আত্মীয় ছাড়া আর কেউ করেনা।

একি শুধু ভদ্রতা ও সৌজন্য বা শুধু বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সহানুভূতি?

এর পেছনে কি প্রেমাস্পদের জন্যে প্রেমিকা তরুণীর আন্তরিক দরদ ও আকুলউদ্বেগ নেই?

শিবপ্রসাদ এখন ওসব ভাবতে পারচে না। বেশিক্ষণ ধরে কোনো কিছু চিন্তা করারঅভ্যাস তার কোনো কালেই নেই। সে চন্দ্রনাথের মত ভবঘুরে লেখক লোক নয় যেতাকে কলম কামড়ে ধরে এক কথা এত ঘণ্টা ধরে ভাবতে হবে।

সে কাজের লোক।

হাসপাতালে সুপ্রকাশের আরও কয়েকদিন কাটলো।

প্রথমদিন জ্ঞান হয়েই সে শুনলে সুমিত্রার কথা। সুমিত্রা তার জন্যে অনেককরেচে।

সুপ্রকাশের কাকিমা তাকে বললেন—সুমি তোর জন্যে এমন করেচে কাল যেনিজের মায়ের পেটের বোনও অমন দরদ দেখায় না বোধ হয়।

সুপ্রকাশ ভাবলে—ঊর্মিলা দেবী আসেননি?

কিন্তু কথাটা সে জিগ্যেস করতে পারলে না।

সেদিন সুমিত্রা বৈকালের দিকে হাসপাতালে এল দেখা করতে, কিন্তু ঊর্মিলা এল না।

সুপ্রকাশ মনে মনে নিরাশ হোল কিছু।

সুমিত্রা তার শিয়রের কাছে একটা টুল নিয়ে এসে বসলে। বললে—আজ কেমনআছেন?

—ভাল আছি সুমিত্রা দেবী। আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, ভাষা খুঁজেপাচ্ছি নে।

সুমিত্রা হেসে বলল—আর ভাষা খুঁজে পেয়ে দরকার নেই—আপনি এখন চুপকরে থাকুন তো একটু!

—আচ্ছা, কাল আর কে কে এসেছিলেন সুমিত্রা দেবী, আমাদের জানাশোনারমধ্যে?

চন্দ্রনাথবাবু, ঊর্মিলা, শিবপ্রসাদবাবু—

সুপ্রকাশের বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ যেন গলা পর্যন্ত এসে থেমে গেল।

ঊর্মিলা! ঊর্মিলা তা হলে এসেছিল!

সে ভাবটা বাইরে দেখাতে চায় না। নিজেকে সংযত করে নিয়ে অন্য কথা পাড়লে।আজও ঊর্মিলা আসতে পারে—ঠিক আসবেই। এখনও আসবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি।

সুমিত্রা বললে—কি করে এ ঘটনা ঘটলো?

—কিছুই জানি নে। এসব জিনিস হঠাৎ ঘটে যায়—জ্ঞান হোল যখন, তখন দেখিহাসপাতালে। কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হয় অন্য লোকের গোলমাল, হৈ-চৈএসব।

—চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল? সে কিছু জানে?

সুপ্রকাশ ব্যাপারটা মনে আনবার চেষ্টা করলে। তারপর যেন খানিকক্ষণ ভেবেবললে—হ্যাঁ। আমি তাঁকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছিলুম গড়িয়াহাটা রোড থেকে।

—চন্দ্রনাথবাবুকে নামিয়ে দেবার কতক্ষণ পরে ঘটনা ঘটে?

—প্রায় পনেরো মিনিট পরে। টালিগঞ্জের পোল পেরিয়ে আসবার অল্প পরে।

হঠাৎ সুপ্রকাশের মনে পড়লো মোটরে বসে তার সঙ্গে আর চন্দ্রনাথের সঙ্গেঊর্মিলার সম্বন্ধে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার ফলেই মাথাটা ওর কেমন যেন হয়েগিয়েছিল। দুর্ঘটনা ঘটেচে হয়তো তার ফলেই। এজন্য সে কাউকে দোষ দেবে না। যা হবার তা হয়েচে—তার নিজের দোষই এতে বেশি।

সুমিত্রা বললে—আমি আজ আসবার সময় ভাবছিলুম আজ আপনাকে এসে ভালই দেখবো—মানুষের মন যা চায়, ভগবান তা পূর্ণ করে দেন—না?

—সব সময় কি করেন—সুমিত্রা দেবী?

—যদি বলি করেন?

—একটা দিক থেকে দেখলে তো হবে না, সকল দিক থেকে একটা জিনিসকে নাদেখলে বিচারের ভুল হতে বাধ্য।

—ভাল কথা, আপনার জন্যে ভাল কমলালেবু এনেচি, একটা দেবো?

—এতক্ষণ বলতে হয়। দিন একটা ছাড়িয়ে!

—বাবার জন্যে কিনেছিলুম কাল মার্কেট থেকে—বাবা খেয়ে খুব ভাল বললেন।তাই আজ আসবার সময় সেই দোকান থেকেই এনেচি।

—আপনার বাবার শরীর আজকাল কেমন?

সুমিত্রা বিষণ্ণমুখে বললে—বাবাকে নিয়ে বড় বিপদেই পড়েচি। দু'দিন থাকেন ভাল, আবার একদিন স্ট্রোক্ হয় কখন যে কি ঘটবে কিছু বলা যাচ্চে না।

—দেখচেন কে?

—ডাঃ চক্রবর্তী দেখছিলেন, নীহার চৌধুরী দেখেচেন—এখন দেখচেন ডাক্তারধরণী দত্ত।

—ডাক্তার দত্ত তো মস্ত বড় হার্ট স্পেশালিস্ট। উনি কি বলেন?

—কেউ কিছু ভয়ের কথা বলেন না। সেটা বুঝতে পারি আমাকে শুধু স্পেয়ার করবার জন্যে। তাতে আমি কিন্তু কোনো ভরসা পাইনে।

—এখন উনি কেমন আছেন?

—ক'দিন থেকে আছেন ভালো। কাল গাড়ি করে বরানগর বেড়াতেও গিয়েছিলেন।এক বন্ধু বাড়ি।

—শিবপ্রসাদবাবু যান না দেখতে?

—গিয়েছিলেন। যান মাঝে মাঝে।

এই সময় লম্বা বারান্দার ওদিকে ঊর্মিলাকে আসতে দেখে সুমিত্রা আনন্দের সুরেবললে—ঊর্মিলা আসচে!

কথাটা শুনে সুপ্রকাশ যেন প্রথমটা চমকে উঠলো—তারপর খানিকটা সামলেনিয়ে বললে—বেশ, বেশ। তবে বড্ড দেরি করে এলেন উনি।

ঊর্মিলা একাই এসেচে, ওর পরনে সাদাসিধে ধরনের শাড়ি ও ব্লাউজ, মাথার চুল অগোছালো ধরনে বাঁধা।

সুমিত্রা বললে—এসো ভাই ঊর্মি, আমরা তোমার কথাই এতক্ষণ বলাবলিকরছিলাম।

ঊর্মিলা লাজুক সুরে বললে—আমার কথা?

সুমিত্রা হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বললে—হ্যাঁ, তোমারই কথা। এখন আসচকোত্থেকে?

—ইস্কুলে আজ মেয়েদের স্পোর্টস্ ছিল, সারা দুপুর রোদ্দুরে মাঠের মধ্যেমোড়লগিরি করতে হয়েচে। তারপর বাসায় গিয়েই সেখান থেকে আসচি।

ঊর্মিলা এসে সুপ্রকাশের শিয়রে সুমিত্রার অপর পাশে বসলো। সুপ্রকাশের দিকেচেয়ে বললে কেমন আছেন আজ?

—তবুও ভাল যে আপনি এলেন। আজ অনেকটা ভাল আছি।

ঊর্মিলা সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—ভাল কথা, অঞ্জলি কোথায়? তাকে তো দেখলুম না কালও?

—সে আজ তিনদিন হোল তার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েচে। ওর যে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বন্ধুটি আছেন, তারই সঙ্গে গিয়েছে। চন্দ্রনাথবাবু এলেন না কেন?

—তা কি করে বলবো? আমি তো তার সব কাজকর্মের লিস্ট রেখে চলিনে?

সুপ্রকাশ বললে—ঊর্মিলা দেবী, আপনি নাকি ভাল গল্প করতে পারেন, একটা গল্পবলুন না?

—কে বললে ভাল গল্প করতে পারি আমি?

—আমি জানি। সুমিত্রা দেবীই বলেচেন।

ঊর্মিলা অনুযোগের সুরে সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—বেশ তো সুমি, আমি গল্প বলতে পারি কে বললে তোমায়?

—ওঃ, সত্যি ঊর্মি, অরুণা তোমার যা সুখ্যাতি করে। শুনে আমার হিংসে হয়।বলে, ঊর্মিলা দিদির মত অমন মুখে মুখে গল্প বানিয়ে কেউ বলতে পারে না। ক্লাসসুদ্ধসব মেয়ে হাঁ করে শোনে ওঁর গল্প।

—ইস্কুলের মেয়েদের সামনে গল্প করা আর সভ্য-ভব্য শিক্ষিত সমাজে গল্প করাএক কথা হল সুমি? সাপ ব্যাঙ রাক্ষসের গল্প শুনতে চান যদি সুপ্রকাশবাবু তো বলতেপারি।

সুপ্রকাশ হেসে বললে—লাইট্ লিটারেচর, এ অসুস্থ অবস্থায় লাইট্ লিটারেচরই ভালো—একটা রূপকথার রাক্ষসীর গল্প বলতে দোষ কি? মাথাটা সুস্থ হবে।

এমন সময় দেখা গেল যে হাসপাতালের বড় বারান্দা ঘুরে শিবপ্রসাদ এদিকেআসচে। সকলের কথাস্রোত যেন একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।

শিবপ্রসাদ এসে হাসিমুখে নমস্কার করে বললে—এই যে সুমিত্রা দেবী, এই যেঊর্মিলা দেবী, একসঙ্গে সকলকেই এখানে পাওয়া যাবে আমিও ভাবছিলুম বটে। সুপ্রকাশবাবু কেমন আছেন আজ?

ঊর্মিলা বললে—আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্চে মস্ত একটা পরিশ্রমের কাজএই মাত্র কোথায় করে এলেন! ব্যাপার কি?

শিবপ্রসাদ হেসে উঠে বললে—আপনার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতাকে প্রশংসা করি। এই কিছুক্ষণ আগে মোটরের চাকা বিগড়েছিল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে। গাড়িতে ছিল মাত্র ক্লিনার। একা চাকা পরাতে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েচে।

সুমিত্রা বললে—গেছলেন কোথায় ওদিকে?

—এমনি একটু বেড়াচ্ছিলুম—নতুন একখানা গাড়ি কিনলাম কিনা—চলুন নাএকদিন সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া যাক্, সুপ্রকাশবাবু সেরে উঠন, তারপর।

সুপ্রকাশ আনন্দের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললে—কিন্তু গাড়ি আমি কিছুদিন এখন চালাবো না। একজন ভাল ড্রাইভার চাই, আর যদি আপনি চালান তো ভালই।

শিবপ্রসাদ ঊর্মিলার দিকে চেয়ে বললে—আপনি যাবেন তো ঊর্মিলা দেবী?

—কবে? আমার ইস্কুলের আবার ছুটি থাকা চাই।

—আপনাকে বাদ দিয়ে তো যাবো না—ছুটির দিনই একটা বেছে নেওয়া যাবে।

সুপ্রকাশ বললে—একটা গাড়িতে হয়তো হবে না। আমার গাড়িখানাও তো আছে, ড্রাইভার চালাবে এখন। শিবপ্রসাদবাবুর গাড়ি না হয় শিবপ্রসাদবাবু নিজেই চালাবেন।

—নিশ্চয়ই, আমি অপরের চালানোতে বিশ্বাস করি না।

সুপ্রকাশ হেসে বললে—বিশ্বাস না করেই আজ আমার এই দশা।

—কিন্তু তার আগে আপনি অন্তত দশ বছর গাড়ি চালিয়ে এসেচেন। কখনো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়নি? সেটাও ভাবুন।

ঊর্মিলা বললে—ও নিয়ে আর তর্কের দরকার নেই। যে হয় গাড়ি চালাবেন। মোটের ওপর আমাদের বেড়ানোটা মারা না যায় তাহলেই হোল।

ভিজিটারদের জন্যে নির্দিষ্ট সময় শেষ হোল। ওরা সকলে সুপ্রকাশের কাছ থেকেবিদায় নিলে।

হাসপাতালের বাইরে এসে শিবপ্রসাদ সুমিত্রাকে বললে—আসুন আপনাকে পৌঁছেদিয়ে যাই। আপনার গাড়ি তো আজ আসেনি দেখচি। ঊর্মিলা দেবী, আসুন, আপনাকেও নামিয়ে দেবো এখন।

ঊর্মিলা বললে, তার যাবার উপায় নেই, সে যাবে শ্যামবাজারে। তাদের স্কুলেরসেক্রেটারির বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কাজেই কলেজ রো'তে তাদের স্কুলের আর একজন শিক্ষয়িত্রী থাকেন, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দুজনে যাবে। গাড়ির দরকার নেই।

সুমিত্রার যাবার ইচ্ছে ছিল না শিবপ্রসাদের সঙ্গে। কিন্তু সকলের সামনে শিবপ্রসাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে এই নিয়ে একটা কথার সৃষ্টি হতে পারে সে গাড়িতে উঠে বসলো।

শিবপ্রসাদ কিছুদূর গাড়ি চালিয়ে এসে জিগ্যেস করলে আপনার সঙ্গে আমারএকটা কথা ছিল সুমিত্রা দেবী!

—এখন কি কথার সময় শিবপ্রসাদবাবু? আমার শরীর ও মন দুই-ই বড় ক্লান্ত আজ। সত্যি বলচি।

—কিন্তু আমার পক্ষে হয়তো সে কথাটা বলবার অবসর আর হয়েই উঠবে না!

—আজ থাক শিবপ্রসাদবাবু, কাল কি পরশু না হয় আপনি আসবেন। বাবার শরীরটা আজ দুপুর থেকে আবার একটু খারাপ।

—বলেন কি? তা হোলে একবার দেখে যাই চলুন।

—এখন তাঁর ঘুমুবার সময়। হয়তো তিনি ঘুমিয়ে পড়েচেন। এখন তাঁকে ওঠানোঠিক হবে না। কালই আপনি একবার আসবেন।

গাড়ী এসে সুমিত্রাদের বাড়ির দোরে পৌঁছলে সুমিত্রা গাড়ি থেকে নেমে গেল।

শিবপ্রসাদ যাবার সময়ে বললে—তা হোলে কাল সকাল ন'টার সময়ে আপনার বাবাকে আমি দেখতে আসবো। আপনি থাকবেন দয়া করে বাড়িতে। নমস্কার।

সে রাত্রে প্রায় দুটোর সময় সুমিত্রার ঘুম ভেঙে গেল। পাশেই ওর বাবার ঘর।। ঘরের মধ্যে থেকে যেন কেমন একরকম শব্দ আসচে, শব্দটা অপরিচিত ধরনের। সুমিত্রার মনে কেমন একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হোল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বাবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে সুইচটা টিপে দিয়ে বললে—বাবা, ও বাবা—

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সুমিত্রা সশঙ্ক সুরে ডাকলে—বাবা—

কেউ কোন দিকে নেই, কেবল ওর বাবার গলার থেকে ঘড় ঘড় ধরনের একটা অস্বাভাবিক শব্দ উঠচে।

সুমিত্রার বড় ভয় হোল।

সে এখন কি করে? কাকে ডাকে এ রাত্রে?

রামধনিয়া বেহারা সুমিত্রার বাবার পুরোনো আমলের চাকর। সে গিয়ে তাকেডাকলে, এ রামধনিয়া, জলদি ওঠো।

রামধনিয়া ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসলো। চোখ মুখে বললে—কি হয়েছেদিদিমণি?

—দ্যাখ্ তো, শিগ্‌গির আয়, বাবু কি রকম করচেন—

রামধনিয়া ছুটে গেল। সে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লোক। দেখেই বুঝলো ব্যাপার কি।কিন্তু সুমিত্রাকে সে কথা বলতে তার বাধলো। বললে—দিদিমণি, ডাক্তারবাবুকে ডেকেআনি।এখন অনেক দূরে কোথায় যাবো, চৌধুরী সাহেবকে ডেকে আনি।

ডাক্তার চৌধুরী পাশের বাড়িতে থাকেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, এখনআর প্র্যাক্‌টিস্ করেন না, তবে পাড়ার লোকের বিপদে-আপদে বিনা ভিজিটেইদেখাশুনো করেন।

ডাক্তার চৌধুরী বৃদ্ধলোক, সুমিত্রাকে ছেলেমানুষ দেখেচেন, তিনি এসে দেখেই বললেন—মা সুমি, তুমি সব বোঝ, তোমায় আর কি বলবো। তুমি শিক্ষিতা, এ সময়ে তোমার ধৈর্য ধরা দরকার।

সুমিত্রা ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি। হাজার শিক্ষিত হোলেও সে এখনও ছেলেমানুষই। সে সশঙ্ক বিস্ময়ের সুরে বললে, কি হয়েচে কাকাবাবু? বাবার শরীর কি খুব খারাপ?

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—মা, তোমাকে একথা বলতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্চে। কিন্তু কি করবো, না বলেও তো পারচিনে—ওঁর শ্বাস হয়েচে—ইট্‌ইজ নাউ এ ম্যাটার অফ্ অ্যান্ আওয়ার অর সো। তুমি অধীর হয়ো না মা। তুমিই তাঁর ছেলের মত—ওঁর শেষ কাজের জন্যে তোমায় বুক বেঁধে তৈরি হতে হবে যে মা!

ডাক্তার চৌধুরী তাঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক বিধবা বোনকেসুমিত্রাদের বাড়িতে আনালেন। ওঁরাই এসে এখানকার সব ভার গ্রহণ করলেন।

সুমিত্রার সংজ্ঞা নেই যেন, সে কি করে যাচ্ছে, কাঠের পুতুলের মত—কিছুই ঠিকনেই।

মিসেস্ চৌধুরী বললেন—মা, তুমি একটুখানি শুয়ে নাও না?

সুমিত্রা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—না কাকীমা, শোবার সময় এর পরে অনেক পাবো। কিন্তু বাবাকে আর যে পাবো না কাকীমা।

কথার শেষদিকে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

মিসেস্ চৌধুরী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা, সুমিত্রার চেয়ে বেশি বয়েস তাঁর বড় ছেলের। তিনি এ সময়ে যা করা উচিত সবই করলেন। সুমিত্রাকে কোলের কাছে টেনে এনে ছোট মেয়ের মত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, অনেক কিছু উপদেশ দিলেন, এসময়ে কি করা উচিত কি না করা উচিত—সে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন।

ওকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—মা, এসময় এসব কথা বলাউচিত নয় জানি, কিন্তু না বললেও তো নয়। তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝ না। তোমারবাবার কোনো উইল আছে?

সুমিত্রা চোখ মুছে বললে—ওসব কথা এখন কেন কাকীমা?

—সবই দরকার যে মা। সংসার বড় ভয়ানক জায়গা, তোমার খুড়তুতো ভাইগুলোতো একটাও মানুষ না—সবই তো জানি।

—উইল একখানা করেছিলেন, লোহার সেফ্-এ আছে। কপি আছে অ্যাটর্নিরবাড়ি।

—টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কের খাতা?

—সব সেফ্-এ—তবে কিছু জুয়েলারি—বিশেষ করে মার গায়ের যেগুলো ছিল সব ব্যাঙ্কে জমা আছে। আমার খুড়তুতো ভাইদের ওপর বাবার তেমন বিশ্বাস ছিল না বলেই মাসে মাসে ভাড়া দিয়েও জুয়েলারি ব্যাঙ্কেই রেখেছিলেন।

—সেফ্-এর চাবি কোথায়?

—হাতবাক্সের মধ্যে। হাতবাক্সের চাবি আমার আঁচলের থোলোয়।

—সেফ-এর চাবি বের করে নিজের কাছে রেখে দাও মা—এখুনি রাখো।বরানগরে এ খবর পৌছুতে দেরি হবে না। দীপ্তি, সঙ্গে যা তো সুমির। দু'জনে যাও, আর কোনো লোকের যাওয়ার দরকার নেই।

—কিন্তু মাসিমা, এসবের এখুনি কি দরকার? আমি যে পাচ্ছিনে মাসিমা। বাবা চলে যাবেন, আর আমি এসব সামলে বেড়াবো? ও মা গো—

সুমিত্রা কান্নার বাঁধ ভেঙে মেঝের ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়লো।

মিসেস চৌধুরী তাড়াতাড়ি করে কাছে মেঝেতে বসে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—মা সুমি, সবই বুঝি। কি করবে বলো মা। ওঠো, এ সময় তোমারবুক বাঁধতে হবে যে—না বাঁধলে চলচে কই? ওঠো—তোমার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েচে, সবইতো বোঝ। আমি তোমাকে কিবোঝাবো—ওঠো মা।

একটু পরে সুমিত্রাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মিসেস্ চৌধুরী তার মেয়ের সঙ্গে পাঠিয়েদিলেন।

সুমিত্রা হাতবাক্স খুলে সেফের চাবি বার করে মিসেস্ চৌধুরীর হাতে এনে দিলে।তিনি বললেন—আমি কি করবো মা?...তোমার আঁচলে বেঁধে রেখে দাও।

স্তব্ধ রাত্রি।

দূরে কোথায় গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটা বাজলো।

সুমিত্রা ওর বাবার শিয়রের একপাশে বসেছিল। অন্য পাশে মিসেস চৌধুরী বসেছিলেন। পায়ের দিকে বসে ছিল দীপ্তি।

মিসেস চৌধুরী বললেন—সুমি, ওঁর মুখে একটু জল দাও মা—তামার কুশি আছেবাড়িতে?তাতে করে দাও।

সুমিত্রা বসে বসে শুধুই কাঁদছিল। চোখ মুছে উঠে সে জল নিয়ে এল এবং মুমূর্ষুপিতার মুখের মধ্যে কোনো রকমে কুশি করে দু'তিনবার জল ঢেলে দিলে।

সুমিত্রার বাবা কিন্তু মরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করলেন। ডাক্তার চৌধুরী সকালেএসে অনেকক্ষণ রইলেন। বেলা প্রায় যখন ন'টা তখন মিসেস্ চৌধুরী দীপ্তিকে বাড়ি পাঠিয়ে খাবার আনালেন। এর আগেই খুব সকালে তিনি বাড়ির ঠাকুরকে ডাকিয়ে খাবারের বন্দোবস্ত করিয়েছিলেন। এক রকম জোর করেই তিনি সুমিত্রাকে নিজে কাছে বসে কিছু খাওয়ালেন। তার পর দীপ্তিকে ও তাঁর বিধবা ননদকে বাড়ি গিয়ে খেয়েআসতে বললেন। ওরা যখন চলে গিয়েচে, শুধু সুমিত্রা ও তিনি আছেন, হঠাৎ মিসেস্চৌধুরীর মনে হোল রোগীর একেবারে শেষ সময় উপস্থিত।

তিনি বললেন—মা, ছুটে গিয়ে আমাদের বাড়িতে ওঁকে একবার এখানে আসতে বলো। আর রামধনিয়াকে ডাকো।

ডাক্তার চৌধুরী আসবার পাঁচ মিনিট পরে বেলা প্রায় পৌঁনে দশটার সময় সুমিত্রারবাবা অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মাস দেড়েক পরের কথা।

সুমিত্রার বাবার শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেছে। মিসেস্ চৌধুরী ঠিক আন্দাজ করেছিলেন—সুমিত্রার দুই খুড়তুতো ভাই এবং বিধবা খুড়ীমা যাঁরা সুমিত্রার বাবা বর্তমানে কোনোদিন এদিকে ঘেঁষবার বড় একটা সুযোগ পাননি—এখন তাঁরা এসেচেন অভিভাবকহীনা সুমিত্রাকে তাঁদের সতর্ক স্নেহদৃষ্টির সামনে সর্বদা রেখে দেখাশুনো করতে।

সুমিত্রার খুড়ীমা গরিব ঘরের মেয়ে, তাঁর স্বামী পাটের দালালি করে বরানগর অঞ্চলে ক্ষুদ্র একখানা বাড়ি কিনেছিলেন। আজ বছর তিনেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেনার দায়ে বাড়িখানা বিক্রি হয়ে যাবার দশা হয়। সুমিত্রার বাবার অর্থসাহায্যে সেযাত্রা বাড়িখানা কোনোরকমে রক্ষা পেয়েছিল। সুমিত্রার খুড়ীমা এসবমনে করে সুমিত্রাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মানুষটি ভালই। কিন্তু তাঁর মূর্খ ওবেকার ছেলেদুটো মনে করে জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তিতে তাদের ন্যায্য ও আইনসঙ্গতঅধিকার বর্তমান। তাদের আশানুরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় বরাবর তারা জ্যাঠামশায়বিশেষত তাদের জ্যাঠতুতো বোনটির ওপর অকারণ বিদ্বেষ পোষণ করে এসেচে। কিন্তুএরা বড়লোক, আর তারা হোল গরিব, এদের বিরুদ্ধে করবেই বা কি ওরা?

বেলা তিনটে।

সুমিত্রার খুড়ীমা দিবানিদ্রা থেকে উঠে এসে সুমিত্রার পড়বার ঘরে ঢুকলেন।

সুমিত্রা একখানা ইংরিজি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল বসে—মুখ তুলে বললে, এসো কাকীমা, বসো। ঘুম ভাঙলো?

—হ্যাঁ, এরা সব কোথায় গেল রে?

—কে? বড়দা, মেজদা? খেলা দেখতে যাবে তো বলছিল, বোধ হয় তাই গিয়েচে।

—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে মা। অনেকদিন থেকেই বলবো বলবো ভাবছি, কিন্তু সময় আর হয়ে ওঠে না।

—কি কথা?

—এখন ছেলেরা কেউ নেই, কথাটা বলি। কিছু মনে কোরো না মা কথাটা বলচিবলে—বলো, মনে করবে না?

সুমিত্রা বিস্মিত দৃষ্টিতে খুড়ীমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—মনে কেন করবোখুড়ীমা! কি কথা এমন!

—আচ্ছা, বট্ঠাকুর কিছু টাকাকড়ি রেখে দিয়েছিলেন— সেগুলো কোথায় আছেমা?

—ব্যাঙ্কে। কিছু আছে লোহার সিন্দুকে।

—তোমাদের গহনাগাঁটি। দিদির তো অনেক গহনা ছিল জানি।

—বেশির ভাগ ব্যাঙ্কে। কিছু আছে সিন্দুকে।

খুড়ীমা আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

সুমিত্রা বললে, কেন একথা বলচো, কাকীমা?

—অনেক কারণ আছে মা। থাক এখন, সে সব কথা এখন আর বলে দরকারনেই। যখন সময় হবে, তখন বলবো। আর একটা কথা বলছিলাম মা।

—কি খুড়ীমা?

—আমারই কথাটা বলা উচিত। তিনি নেই, বট্ঠাকুরও নেই। তুমি লেখাপড়াশিখেচ বটে কিন্তু ছেলেমানুষ। সংসারের কি বোঝ এখন? কিছুই না। আমি না বললেকে কথাটা বলবে? তোমার দাদারা কেউ মানুষ নয় মা, দেখতেই পাচ্ছ সব।

—বল কাকীমা কি বলবে?

—তোমার বিয়ে করা উচিত এই সময়। আর দেরি করা উচিত নয়। কি বললোতুমি?

—তাড়িয়ে দেবার তাড়া কেন অত কাকীমা?

ছিঃ ছিঃ মা—বালাই ষাট্। অমন কথা বলতে নেই। তুমিই ঘরের মালিক মা, আমাদের কি ক্ষমতা আছে তোমাকে তাড়াবার?

—ও কথা বোলো না কাকীমা। তুমি থাকতে আমি মালিক কি কথা হোল? মা থাকতে মেয়ে কর্তা কিসের?

—বেশ মা, তা হোলে আমার কথা শোনো। এই সামনের বোশেখে বিয়ে দিয়ে দিই। আমি নিজেই দেখি শুনি, কি বলিস্!

সুমিত্রা চুপ করে রইল। সে এর কি জবাব দেবে? মন যেখানে হয় তো চায়— সেখানে কত বাধা। সুপ্রকাশবাবুর সঙ্গে কতকাল দেখা হয়নি। হাসপাতাল থেকে বার হয়ে সুপ্রকাশ হাওয়া বদল করতে গিয়েচে মুসৌরি। সেখানে এখনও রয়েচে।

সেদিন একখানা চিঠি এসেছিল। সুপ্রকাশ লিখেচে, দূর প্রবাসে যখন পরিচিতবন্ধুদের মুখ মনে পড়ে তখন মনটা ছট্ফট্করে ওঠে—ইচ্ছে হয় পালিয়ে আসে কলকাতায়। সেখানে আর সে থাকতে পারছে না—ইত্যাদি।

চিঠিখানা কিন্তু নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক।

সে রকম চিঠি পেয়ে কোনো তরুণী সন্তুষ্ট হতে পারে না—সুমিত্রা তো আদৌহয়নি।

তবে এই ভেবে আনন্দ পেয়েছিল যে, কলকাতায় সুপ্রকাশের এত বন্ধুবান্ধব থাকতে তাকেই চিঠিখানা লিখেচে তো?

সুমিত্রাও নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই চিঠিখানার উত্তর দিয়ে দিয়েচে। তাতে অঞ্জলির কথা আছে, ঊর্মিলার কথা আছে, শিবপ্রসাদের কথা আছে, বাবার মৃত্যুসংবাদটা ছোট্ট করেদেওয়া আছে—এই মাত্র।

এ চিঠির কোন জবাব এখনও আসেনি।

এ সব কথা কাকীমাকে বলা যায় না।

বিয়ে ছেলেখেলা নয়—যেখানে সেখানে অন্ধের মত সে গিয়ে উঠতে রাজি নয়।

চন্দ্রনাথবাবুর কথা প্রায়ই মনে হয়। কেন জানি না, সুমিত্রা কতবার বারান্দায়দাঁড়িয়ে পথের দিকে অকারণে চেয়ে চেয়ে ভাবে—চন্দ্রনাথবাবু এদিকে একবার আসেন না?

কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথের সঙ্গেও সুমিত্রার আর দেখা হয়নি।

চন্দ্রনাথবাবুও এখানে নেই—শুনেচে সুমিত্রা—ঊর্মিলার কাছেই শুনেচে।

ভদ্রলোক দেশে গিয়েচেন। সেখানে ওঁর এক জ্যাঠামশায় বড় অসুস্থ। জ্যাঠামশায়অবস্থাপন্ন লোক, ছেলেপুলে নেই—কাজেই চন্দ্রনাথকে দেখাশুনো করতে হচ্চে এসময়ে। চন্দ্রনাথ নাকি তার জ্যাঠামশায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারীও। ঊর্মিলাই একদিন কথায় কথায় এসব বলেছিল দিন কুড়ি আগে।

এখানে আসবার মধ্যে আসে শিবপ্রসাদ।

সে অদ্ভুত ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এখনও সমান ভাবে যাতায়াত চালায়। সুমিত্রার বাপের মৃত্যুর পর দেখাশুনো করার ওজুহাতে একটু ঘন-ঘনই আসে।

কাকীমার সঙ্গে শিবপ্রসাদ বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেচে। কাকীমা প্রায়ই বলেন—ছেলেটি বড় ভাল। বড্ড অমায়িক ছেলেটি।

কাকীমার কাছে শিবপ্রসাদ যথেষ্ট যত্ন আদর পায় বলেই বোধ হয় তার উৎসাহটাইদানীং একটু বেড়েচে।

কিন্তু শিবপ্রসাদের সম্বন্ধে সুমিত্রা নানা রকম কথা শুনতে পায়। ঊর্মিলার ওখানেও নাকি আজকাল সে যাতায়াত শুরু করেচে—এমন কি দু'একদিন মোটরে ঊর্মিলাকে নিয়ে বেড়াতেও বার হয়েচে।

ঊর্মিলা একথা তাকে কিছু বলেনি সে শুনেচে অন্য জায়গা থেকে।

সুমিত্রার মনে হয়েচে, চন্দ্রনাথবাবু থাকলে শিবপ্রসাদ এভাবে ঊর্মিলার সঙ্গেমিশতে সাহস করতোনা—চন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শিবপ্রসাদ সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ।সম্ভবত ঊর্মিলার কোনো দোষ নেই এ ব্যাপারে। সে সহজ ভাবেই জিনিসটা গ্রহণ করে থাকে নিশ্চয়ই।

এই সময় একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে চন্দ্রনাথ এসে সুমিত্রাদের বাড়ি হাজির।সুমিত্রা বেয়ারার মুখে শুনলে বাইরের ঘরে চন্দ্রনাথ এসেচে—তার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্ত ওপরের দিকে ঠেলা মেরে বেরিয়ে আসতে চেয়ে ওর সারা দেহেএক আলোড়নের সৃষ্টি করলে। নিজের ভাববিপর্যয়ে সুমিত্রা নিজেই শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

চন্দ্রনাথ হাত তুলে নমস্কার করে বললে—আসুন সুমিত্রা দেবী, সবই শুনলুম এখানে এসে। ভাবলাম তখনই আসি—কিন্তু তখন রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই আজসকালেই ছুটে এলাম। অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েচি শুনে।

সুমিত্রার অত্যন্ত ভাল লাগলো চন্দ্রনাথের এই আন্তরিক হৃদ্যতা ও সহানুভূতি। অন্তত সুমিত্রার মনে হোল এ পর্যন্ত যার কাছে যত সহানুভূতির কথা শুনেচে, চন্দ্রনাথের কথা সব চেয়ে আন্তরিক ও খাঁটি।

সুমিত্রা পাশের কৌচে বসে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের দিকে চাইলে। যেন ওর পিতার মৃত্যুর পর আপন বলতে কারো দেখা এতদিন সে পায়নি, কেউ এমন করেতাকে সমবেদনা জানায়নি, আজ যা সে চন্দ্রনাথের কাছে পেল।

সুমিত্রা নিজেকে অনেকটা সংযত করে নিয়ে বললে—আপনি এতদিন ছিলেনকোথায়?

—দেশে। সে অনেক কথা, পরে বলবো সব। এখন আপনার কথাই জিগ্যেস করিআগে। আমার কথা শোনবার অনেক সময় আছে। এখানে আছেন কে এখন?

—আমার এক খুড়ীমা এসেচেন।

—বেশ, খুব ভাল। এ সময়ে আপনার জন কাছে থাকা বড় দরকার। তবে একটি কথা বলি সুমিত্রা দেবী, আমি যখন এসে পড়েচি তখন আমাকে পুরোনো বন্ধু বিবেচনাকরে আপনার যা কিছু সুবিধে অসুবিধে নিঃসংকোচে আমাকে জানালে আমি নিজেকেধন্য মনে করবো।

সুমিত্রা সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল।

চন্দ্রনাথ বললে—সুপ্রকাশবাবু তো শুনলুম মুসৌরী, শিবপ্রসাদবাবু কোথায়?

—এখানেই আছেন।

—এখানে আসেন না?

—মাঝে মাঝে আসেন বৈকি। তবে আজকাল ঊর্মিলার কাছেই তাঁর যাতায়াতএকটু বেশি।

চন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে বললে—ঊর্মিলা দেবীর কাছে?

—হ্যাঁ। এই রকমই তো জানি।

চন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বললে—ও!

—আপনাকে এ সম্বন্ধে কথা বলবার ছিল। কথাটা যখন উঠলো তখন বলেফেলাই ভাল মনে করচি।

—হ্যাঁ, কি বলুন?

—এই শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে ঊর্মিলার মেলামেশিটা আমার তত ভাল মনে হয় না। ওরা মোটরে বেড়াতে গিয়েচে দু'একদিন তাও শুনেচি। শিবপ্রসাদবাবুকে যতটা জানি, তাতে আমার মনে হয় না এ থেকে ভাল কিছু হবে।

চন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবেই বললে—আমারও তাই মনে হয়।

—আমার মনে হয় ঊর্মিলাকে আপনি কিছু বলুন এ সম্বন্ধে।

—আমি! আমি ঊর্মিলা দেবীর আইনসঙ্গত অভিভাবকও নই, কিছুই নই। আমারবলবার অধিকার কি? আমি বলতে গেলে তিনি ফোঁস্ করে উঠবেন।

—উঠুক। তবুও বললে আপনারই বলা উচিত।

—বেশ বলবো, আপনি যখন বলচেন। তবে যদি সে বলে কোথা থেকে আপনিএ সব শুনলেন?

—আমার নাম করতে পারেন অনায়াসেই।

—না, তা আমি করবো না। কারো নাম আমি করবো না। আজই ওবেলা তাঁকে আমি বলচি। আজ তা হোলে উঠি সুমিত্রা দেবী!

সুমিত্রা অভিমানের সুরে বললে—এই তো এলেন! বসুন আর একটু। ঊর্মিলার ওখানে হোলে কি এখনই উঠতে চাইতেন? বসুন, চা আনি।

—না না, এখন অসময়ে চা আনার দরকার নেই সুমিত্রা দেবী।

সুমিত্রা চন্দ্রনাথের কথায় কান না দিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে আবার পূর্বের আসনটিতে বসলো।

চন্দ্রনাথ বললে—সুমিত্রা দেবী, আমার নতুন উপন্যাসের একটা অধ্যায় শুনবেন?

সুমিত্রা অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠে বললে—আছে নাকি সঙ্গে? দয়া করেপড়বেন? ভারি ভাল হয়। খুড়ীমাকে ডেকে আনি। উনি আপনার বই অত্যন্ত আগ্রহেরসঙ্গে পড়েন।

—তাই তো, আমার দুর্ভাগ্য যে এমন সব গুণী শ্রোতাদের সামনে লেখা পড়বারসুযোগ এখনি ঘটলো না। লেখাটা আমার কাছে এখনই নেই—এনে পড়বো অন্য সময়তাই বলছিলুম।

—বেশ, ওবেলা এখানে এসে চা খাবেন আর আমাদের উপন্যাস শোনাবেন, কেমনতো?

চন্দ্রনাথ একটু বিপদে পড়ে গেল—ওবেলা সে ঊর্মিলার ওখানে যাবার জন্যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। আজ যদি না যাওয়া ঘটে—তবে আবার দু'দিন দেরি হয়ে যাবে, কারণ বিশেষ কাজে তাকে একটু কলকাতার বাইরে যেতে হবে।

তবুও তাকে বলতেই হোল যে সে ওবেলা আসবে এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তার নিজের রচনা পাঠ করে শোনাবে।

সেইদিনই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুমিত্রাদের সান্ধ্যআসরে দেখা গেল শিবপ্রসাদকে।চন্দ্রনাথ তখনও আসেনি।

শিবপ্রসাদকে অনেকদিন সুমিত্রাদের বাড়ি দেখা যায়নি। ঠিক আজই শিবপ্রসাদকেদেখে সুমিত্রা একটু বিব্রত হয়ে উঠলো মনে মনে।

শিবপ্রসাদ বললে—আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম সুমিত্রা দেবী।

—কি বলুন?

—আমরা একটা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করেছি। আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে?

—কে কে যাবেন? কবে বলুন!

—ঊর্মিলা দেবী যাবেন, আমি তো আছিই। আমার বোন প্রতিমা যাবে। তাকে আপনি বোধ হয় কখনো দেখেননি। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠলো, স্কটিশে পড়ে।

সুমিত্রা উত্তর দেওয়ার পূর্বেই চন্দ্রনাথ সকলকে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকলো।হঠাৎ চন্দ্রনাথের আগমনে শিবপ্রসাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো—সে এখানে এ সময়ে চন্দ্রনাথের আগমন প্রত্যাশা করেনি।

সুমিত্রা বললে—আসুন, আসুন চন্দ্রনাথবাবু। আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। খুড়ীমা তো এর মধ্যে খবর নিয়েচেন আপনি এলেন কিনা।

শিবপ্রসাদ তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, কেন চন্দ্রনাথের জন্যে বাড়িসুদ্ধ অপেক্ষা করছে এবং কেনই বা সুমিত্রার খুড়ীমা হঠাৎ চন্দ্রনাথের আগমনের প্রতীক্ষায়এত ব্যস্ত হয়ে উঠেচেন।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ পকেট থেকে রচনার খাতা বার করার পর শিবপ্রসাদের কাছে সব ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। সে মন দিয়ে শোনবার ভান পর্যন্ত করলে না, স্পষ্টতই অধীর হয়ে উঠলো।

পড়বার মধ্যে এক জায়গায় সুমিত্রা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো—বাঃ কিচমৎকার! ওই প্যারাটা আর একবার পড়ুন না?

শিবপ্রসাদ সেই সময় হঠাৎ হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে—এক্সকিউজ মি, যদি কিছু মনে না করেন চন্দ্রনাথবাবু, আমার একটা এন্‌গেজমেন্ট্ আছে এখুনি—আমাকে একবার যেতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা সুমিত্রা দেবী, আমার প্রস্তাবটার কিহোল?

সুমিত্রা চন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বললে—ও, আমার মনেই ছিল না একেবারে।যাবেন চন্দ্রনাথবাবু? শিবপ্রসাদবাবু বলছিলেন, একটা পিক্‌নিকের কথা। ঊর্মিলা যাবে, শিবপ্রসাদবাবু যাবেন। ওঁর বোন প্রতিমা যাবে—যদি যান তো চলুন।

চন্দ্রনাথ বললে—আপনি যাবেন তো?

—সবাই যদি আপনারা যান, কেন যাবো না?

চন্দ্রনাথ বললে—আমার যাওয়া সম্ভবত ঘটে উঠবে না, কতকগুলো দরকারী কাজ রয়েচে কিনা। আপনারা যান, ভালই তো!

সুমিত্রা অনেকটা আবদারের সুরে বললে—থাকুক কাজ। আপনাকে যেতেই হবে।

শিবপ্রসাদ প্রথম থেকেই পছন্দ করেনি যে চন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে যাবে। এখনসুমিত্রার কণ্ঠস্বরের আগ্রহাতিশয্যে ও চোখমুখের ভঙ্গিতে তার মনে কি হোল জানি না, সে হঠাৎ অধীর ও অসংযত বিরক্তির সুরে বলে উঠলো—যদি ওঁর কাজ থাকে তবেওঁকে না বলাই ভালো। কাজের ক্ষতি করে কি করে উনি যাবেন?

সুমিত্রা শিবপ্রসাদের কথায় যেন কান না দিয়েই আবার আগের মত সুরেইবললে—বলুন যাবেন?

—আচ্ছা বেশ, তাই হবে। আমি গেলে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তবে নিশ্চয়ইযাবো।

পরে শিবপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললে—কবে যাওয়ার কথা হচ্চে শিবপ্রসাদবাবু?

শিবপ্রসাদ নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল—যাওয়া? হ্যাঁ—দেখি—কবে হয়। এখনও কিছু হয়নি। দেখি—

চন্দ্রনাথ আবার পড়বার জন্যে খাতার পাতা ওলটাতেই শিবপ্রসাদ ব্যস্তভাবেবললে—তাহোলে সুমিত্রা দেবী—আমি এখন উঠি।

সুমিত্রা বললে—বা, বসুন চা আনি! চা না খেয়ে যাবেন কি রকম? তা ছাড়াচন্দ্রনাথবাবুর উপন্যাসটা শুনবেন না? লেখকের মুখে তাঁর রচনা পাঠ শুনতে পাওয়াসব সময়ে তো ঘটে না—বিশেষ করে চন্দ্রনাথবাবুর মত লেখকের।

শিবপ্রসাদের মুখ ঈর্ষায় কালো হয়ে উঠলো। সে স্থান, কাল এবং ভদ্রতার দাবি বিস্মৃত হয়ে সুমিত্রার সামনেই বলে বসলো—আমরা একটু প্র্যাকটিকাল ধরনের লোকসুমিত্রা দেবী, ওসব রূপকথা শুনে সময় ব্যয় করার মত সময় এখন আর বড় একটাপাইনে।

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরনের রূঢ় উত্তরে সুমিত্রার মুখ অল্পক্ষণের জন্য রাঙাহয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সে চকিত দৃষ্টিতে চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাইলে। কারণ সেতখনই বুঝলে যে এ উক্তির কটুতা চন্দ্রনাথকে যত আঘাত করবে ততটা অন্য কাউকেনা।

শিবপ্রসাদের স্থূলদৃষ্টি সুমিত্রার এ চকিত দৃষ্টির বাণী বুঝতে পারলে না। বুঝলেচন্দ্রনাথ।

কি গভীর সহানুভূতি, ক্ষমাপ্রার্থনা, লজ্জা ও প্রেমের স্পর্শে আহত স্থানকে জুড়িয়ে দেওয়ার আন্তরিক আগ্রহ ছিল সুমিত্রার সে দৃষ্টির মধ্যে ভরা।

চন্দ্রনাথ হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলো। কেন, সে নিজেই বুঝতে পারলে না।

সে কোনো একটা মামুলি ধরনের উত্তর দেওয়ার আগেই সুমিত্রা চা ও খাবার আনবার অছিলায় ঘরের বার হয়ে গেল।

এরপরে আর সেদিন উপন্যাস পাঠ জমলো না। চা ও খাবারের সদ্ব্যবহার করেচন্দ্রনাথও বিদায় নিতে চাইলে। শিবপ্রসাদও যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

সুমিত্রা বললে—চন্দ্রনাথবাবু একটু বসুন না? আমি শিবপ্রসাদবাবুকে এগিয়ে দিয়েআসচি।

নিচে নেমে শিবপ্রসাদ সুমিত্রাকে জিগ্যেস্ করলে—আমার প্রস্তাবের কোনোজবাবই তো পেলাম না সুমিত্রা দেবী?

—কোন্ প্রস্তাব?

—সেই আউটিং আর পিক্‌নিকের—যেদিন হয়—সেটা নির্ভর করচে আপনারওপর।

—বেশ যাবো।

—একটা কথা আছে এর মধ্যে—যদি কিছু মনে না করেন—

—কি বলুন?

—চন্দ্রনাথবাবুও যাবেন কি?

—নিশ্চয়ই। উনি তো বললেন।

—কথাটা বলচি এই, আমার বোন প্রতিমা বড় লাজুক এবং একটু সেকেলে ধরনের মেয়ে। সকলের সামনে বেরোয় না। আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকলে—মানে বুঝলেন না?

—আপনি কি চন্দ্রনাথবাবুকে বাদ দিতে বলচেন?

—না, আমি—আমি তা বলিনি—তবে—

—ওঁকে আমিই বললুম, এখন ওঁকে বাদ দেবো কি করে বলুন? তাহলে আমারওযাওয়া হয় না—হয় কি?

—তা বটে—তা বটে—বেশ, বেশ। না, বাদ দিতে আমি বলিনি, তবে শুধু প্রতিমার জন্যেই বলছিলাম—আচ্ছা বেশ চলুন উনিও।

—না বুঝুন, আপনাদের যদি অসুবিধে হয়, তবে এবার না হয় আমরা—মানেচন্দ্রনাথ বাবু না-ই গেলেন।

—না, না, প্রতিমাকে আমি রাজি করিয়ে নেবো এখন। কিছু অসুবিধে হবে না।

শিবপ্রসাদ চলে গেলে সুমিত্রা এসে চন্দ্রনাথকে বললে—আপনার কাছে আমারক্ষমা চাইবার আছে, সেই কথাটি বলবার জন্যেই আপনাকে বসিয়ে রেখেচি। আমাকে ক্ষমা করুন।

চন্দ্রনাথ বিস্মিত কণ্ঠে বললে, কি করলেন আপনি?

—এই শিবপ্রসাদবাবুর—এই ব্যাপারটা—

চন্দ্রনাথ কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললে—ওঃ—এই! আমার তোপ্রাণ উড়ে গিয়েছিল ভয়ে। যে ট্র্যাজিক সুরে আপনি কথাটা বললেন—উঃ, সত্যি—

কথা শেষ করে চন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো।

কোথা থেকে অপরূপ লজ্জা এসে সুমিত্রাকে আশ্রয় করলে সে নিজেই জানে না। কেন যেন চন্দ্রনাথের এই উক্তি সুমিত্রার কাছে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে মনে হোল।ওর চোখদুটি লজ্জার ভারে নত হয়ে পড়লো।

চন্দ্রনাথের বিদায় নেবার সময় সুমিত্রা বললে—আপনার কিন্তু যাওয়াই চাইবেড়াতে, নইলে—

চন্দ্রনাথ হেসে বললে—নইলে কি শাস্তির ব্যবস্থা করবেন সুমিত্রা দেবী?

—নইলে আমিও যাবো না।

চন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চেয়ে রইল।

ঊর্মিলা শিবপ্রসাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আজই শিবপ্রসাদ এসে ওকেজানিয়ে যাবে কবে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

ঊর্মিলা একটা কথা খুব ভাল রকম বুঝেচে এই কয়দিনে। নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে সে দেখেচে।

সে শিবপ্রসাদের সঙ্গে বেড়ায়, শিবপ্রসাদের আগমনের প্রতীক্ষায় এক এক সময়অধীর হয়ে থাকে, কিন্তু সে কেবল জীবনের একঘেয়েমিটা কাটাবার জন্যে, হয়তোমোটরে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবার লোভে, একটু নতুনত্বের টানে।

কিন্তু শিবপ্রসাদ তার কেউ নয়।

বরং চন্দ্রনাথ এলে ঊর্মিলা আনন্দ পায়, বন্ধুত্বের সহজ আনন্দ...ওর চোখে মুখেপ্রীতি বিকশিত হয়ে ওঠে...তবে সকলের চেয়ে, সব লোক ছাপিয়ে তার মন কার কথাসব সময় ভাবে? কার সান্নিধ্যের কথা ভাবলেই তার বুকের রক্ত দুলে ওঠে?

বহু দূরে সে আছে, কিন্তু তার চিন্তা কি একদিনও ঊর্মিলার মন থেকে অবসরনিয়েছিল?

কেন এমন হয়?

কতদূরে যে আছে, কতদিন যার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, প্রতিদিনের বন্ধুদের ফেলেমন তার কথাই এত বেশি করে ভাবে কেন?

অথচ সে তো চিন্তা করে না। কই, একখানা চিঠি দিয়েচে সুপ্রকাশ এতদিনের মধ্যে? একবার খোঁজ নিয়েচে সে মরে গিয়েচে না বেঁচে আছে?

ঠিক এই সময়ে শিবপ্রসাদের পায়ের শব্দ বাইরের বারান্দায় শোনা গেল। ঊর্মিলাউঠে দোর খুলে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হোল।

শিবপ্রসাদ ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললে—একি, আপনি তৈরি নন? আমি যেএকেবারে বেরুবো বলে তৈরি হয়ে এসেচি!

ঊর্মিলা বললে—ভালই তো, বসুন। তৈরি হয়ে নিচ্চি। সাত মিনিট!

ঊর্মিলার কথার ধরনে শিবপ্রসাদের হাসি পেল—বললে—বলেন কি ঊর্মিলাদেবী, সাত মিনিট—পৌনে আট মিনিট নয়?...বেশ, বেশ, নিন তৈরি হয়ে।

—আর কে কে যাবেন?

—আজ তো আর কেউ না! পিক্‌নিকের দিন রবিবার দিন ঠিক করলে আপনারঅসুবিধে হবে কি? সুমিত্রা দেবী, চন্দ্রনাথবাবু, প্রতিমা—আর আপনি—এ অধম ড্রাইভকরবে।

ঊর্মিলা হেসে ভেতরে চলে গেল, বললে—বসুন, আসচি।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। শিবপ্রসাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে।মাঠের ধারের রাস্তায়।

ঊর্মিলা ও শিবপ্রসাদ গাড়ি থেকে নেমে মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর বসেচে।

অনেকক্ষণ ধরে ওদের মধ্যে তর্ক চলচে মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থা হয় তাইনিয়ে; ঊর্মিলা বিশ্বাসবতী, শিবপ্রসাদ নাস্তিক।

রাত প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। ঊর্মিলা বললে—আজ থাকুক, শিবপ্রসাদবাবু।পিক্‌নিকের দিন বাইরে গিয়ে আবার আরম্ভ করা যাবে তর্ক। কিংবা সেদিন জুরিরবিচারের ওপরও ফেলা যায়। সুমিত্রা, প্রতিমা, চন্দ্রনাথবাবু—

চন্দ্রনাথ আর চন্দ্রনাথ! যেখানে শিবপ্রসাদ যাবে সেখানেই কি চন্দ্রনাথ জুটে বসেআছে? রাগ ও ঈর্ষায় শিবপ্রসাদের সর্বশরীর জ্বলে উঠলো।

পরক্ষণেই সে হঠাৎ বললে—ঊর্মিলা দেবী, একটা কথা বলবো?

ওর গলার সুরে ঊর্মিলা একটু বিস্মিত হোল। বললে—কি বলুন?

—যদি সাহস দেন তো বলি।

—বা রে, বলুন না?—কি কথা—

—আমার ঘরে দয়া করে যদি আপনি পদার্পণ করেন, তবে আমি ধন্য হয়ে যাই।কথাটা অনেকদিন থেকেই বলবো ভেবেছি—কিন্তু আপনাকে লক্ষ্মীরূপে গৃহে পাওয়ারঊর্মিলা বাধা দিয়ে বললে—শিবপ্রসাদবাবু—

ওর কণ্ঠস্বর নীরস।

—এ আশা কি কোনেদিন করতে পারিনে ঊর্মিলা দেবী?...

—আমায় ক্ষমা করবেন, শিবপ্রসাদবাব। চলুন, রাত হয়েছে অনেক—আজ উঠি।

শিবপ্রসাদ এ ধরনের সরাসরি প্রত্যাখ্যান আশা করেনি বোধ হয়। সে আর কোনোকথা না বলে মোটরে গিয়ে উঠলো। সারাপথ ঊর্মিলার সঙ্গে সে একটা কথাও বললে না।কেবল ঊর্মিলাকে নামিয়ে দেবার সময়ে গাড়ির দোর খুলে দিয়ে সংক্ষেপেবললে—আচ্ছা নমস্কার—ঊর্মিলা দেবী।

ফ্ল্যাটে এসে ঊর্মিলা জানালার কাছে অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল। তার চোখেঘুম আর আসে না।

সে ভীষণ ভুল করেচে শিবপ্রসাদকে প্রশ্রয় দিয়ে।

যে তার কেউ নয়, তার সঙ্গে অত মাখামাখি করে সে নিতান্ত নির্বোধের কাজকরেচে।

শিবপ্রসাদের সে দোষ দিচ্চে না। দোষ সম্পূর্ণ তারই। সে প্রশ্রয় না দিলে শিবপ্রসাদবিবাহের প্রস্তাব করতে সাহস করতো না। বিবাহের প্রস্তাব করা দোষের হয়নি—পুরুষ মাত্রেই তা করে থাকে এ অবস্থায়। বরং শিবপ্রসাদের ব্যবহার সেদিক থেকে সম্পূর্ণভদ্রোচিত—কিন্তু শিবপ্রসাদের পরবর্তী ব্যবহারের সুস্পষ্ট রূঢ়তায় সে নিজেকেঅপমানিতা বিবেচনা করেচে।

আর একটা কথা ভাল ভাবেই তার মনে হয়েচে এ ব্যাপারের পরে—মন আরকাউকে চায় না।...

বিবাহের প্রস্তাবে আজ সে নিশ্চয়ই খুশি হোত, যদি আলেয়ার পেছনে তার মন নাছুটতো।...

দরকার নেই বিয়ে-থাওয়া করে, সংসারী হয়ে। She will die an old maid—তবুও নিজের সত্তা সে যাকে তাকে বিলিয়ে দিতে পারবে না।

ওদের পিক্‌নিকের দিন এসে গেল।

শিবপ্রসাদকে খুব উৎসাহী ও নাছোড়বান্দা লোক বুঝতে হবে। সে সকলকে জোগাড় করে দুখানা মোটর বোঝাই জিনিসপত্র ও লোকজন নিয়ে যশোর রোডের ধারে মসলন্দপুর ডাকবাংলোয় হাজির হোল।

সুমিত্রা, ঊর্মিলা, চন্দ্রনাথ, প্রতিমা সবাই এসেচে। আর এসেচে মঞ্জু বলে একটিছোট মেয়ে, প্রতিমার ভাগ্নী, আর রঘু ও গৌর দুই চাকর।

চমৎকার দিন। ডাকবাংলোর সিকি মাইল দূরে একটা বড় পুকুর। লাল ফুল ফুটে আছে নানা রংয়ের। ওখানে মেয়েরা স্নান করে এল। অনেক লাল ফুল তুলে এনেচে ওরা। লাল ডাঁটার তরকারী হবে, সুমিত্রার খেয়াল গিয়েচে।

শিবপ্রসাদের ব্যবহার আজ আবার এত খোলাখুলি ও অমায়িক যে ঊর্মিলা একটুমুগ্ধ না হয়ে পারলে না।

সকালে গাড়িতে প্রতিমা ও মঞ্জুকে নিয়ে শিবপ্রসাদ ঊর্মিলার ফ্ল্যাটে গিয়েচে। যেনকিছুই ঘটেনি এমনি ধরনে তাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে সুমিত্রার বাড়ি এসেচে। সেখানে চন্দ্রনাথ পূর্বব্যবস্থামত উপস্থিত ছিল। বেলা আটটার মধ্যে সকলকে গুছিয়েনিয়ে বেরিয়ে যশোর রোডদিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলে এল সে। অন্য গাড়িখানা সুমিত্রানিজে জোগাড় করেচে।

মেয়েরা রান্না করচে, শিবপ্রসাদ এসে বললে—কি হচ্চে ওটা সুমিত্রা দেবী?

—লাল ডাঁটার চচ্চড়ি হচ্চে।

—বেশ বেশ। একটু ঝাল দেবেন বেশি করে—আমি আবার ঝালের বড় ভক্ত।

ঊর্মিলা মাংস মাখছিল, মঞ্জুর সাহায্যে। বললে—মেয়েদের রান্নার কাজে আপনার পরামর্শ না হোলেও চলবে।

শিবপ্রসাদ হেসে ঊর্মিলার সামনে বসে পড়লো। বললে—তবে তো এ অযাচিত। পরামর্শ আমায় ভাল করেই দিতে হোল।

ঊর্মিলা হেসে বললে—কি পরামর্শ দেবেন শুনি?

—মাংস দই দিয়ে মাখবার স্টেজে ওতে কিস্‌মিস্‌ দিতে হয় জানেন?

—থাক্‌ থাক্‌, পরামর্শটা তুলে রেখে দিন অন্য লোকের জন্যে।

—রাঁধতে জানেন বলে মেয়েদের যে এই গর্ব—এর মূলে কিছু নেই। জগতেরমোটা মাইনেওয়ালা রাঁধুনী সব পুরুষমানুষ তা জানেন?

হাল্‌কা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সময় বেশ কেটে যাচ্চে।

ঊর্মিলা একবার ভাবলে, শিবপ্রসাদ লোক ভালোই। কারো বিরুদ্ধে কোনোঅভিযোগ পুষে রাখবার পাত্র সে নয়।

বেলা একটার সময় আহারাদি শেষ হোল সকলের। শিবপ্রসাদের ভগ্নী প্রতিমাসকলের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেচে। সে যেমন সুন্দর রাঁধে, তেমনি পরিপাটি করেপরিবেশন করতে পারে। তার কথাবার্তা তেমনি মিষ্টি। প্রতিমা পুরুষদের একা পরিবেশন করলে, তারপর মেয়েদেরও খাইয়ে নিজে সকলের শেষে সামান্য কিছু মুখেদিলে।

তিনটের পর রোদের তেজ কমে চারিদিকের বড় বড় গাছপালায়, ডাকবাংলোরমাঠে ছায়া পড়ে এল। তখন সকলে আবার যার যেদিকে ইচ্ছে বেড়াতে বেরুলো।নিকটেই একটা বিল।

শিবপ্রসাদ এরই মধ্যে কখন গিয়ে নৌকো ঠিক করে এসেচে পাশের গ্রামে—সকলকে নিয়ে বিলে নৌকোয় বেড়াতে যাবে। বেলা আর একটু পড়লেই মাঝি দুজন এসে ওদের ডাকবে।

চন্দ্রনাথ কেবল ডাকবাংলোর পাশেই একটা শিশুগাছের তলায় আপন মনে বসে ডায়েরী লিখছিল। রোজ ডায়েরী লেখা ওর একটা বহু পুরোনো অভ্যেস।

এ সময় সুমিত্রা ওর কাছে গিয়ে বললে—কি করচেন?

—আসুন, আসুন, ডায়েরী লিখচি!

—কি লিখচেন আমি দেখবো। দেখবো আমার নাম ওতে আছে কিনা।

কথা শেষ করে সুমিত্রা দুষ্টুমির হাসি হাসলে।

চন্দ্রনাথ বললে—আমি যদি না দিই?

—জোর করে দেখবো—বলে সত্যিই সুমিত্রা ডায়েরীখানাতে হাত দিলে।

চন্দ্রনাথ নিরুপায়ের সুরে বললে—দেখুন তবে।

ডায়েরী খুলে প্রথম কয়েক ছত্র পড়েই সুমিত্রা কৌতুকের সুরে বলে উঠলো—লুকিয়ে লুকিয়ে এসব কি? ধরে ফেলেচি ঠিক তো!

পরে কৃত্রিম কোপের সুরে বললে—আমার নাম লিখেচেন যে বড়? ভদ্রমহিলারনাম চুপি চুপি লেখবার মানে কি জিগ্যেস করতে পারি কি?

কিন্তু আর কয়েক ছত্র পড়ে সুমিত্রার গণ্ড লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়। বোধ হয় চোখ দুটো অপ্রত্যাশিত খুশির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তখনি আবার গম্ভীর ওসংযত ভাব ধারণ করলে।

চন্দ্রনাথ অসহায়ের কাতর দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে ছিল, ডায়েরীখানা সুমিত্রা ফেরতদিলে সে শুধু বললে—রাগ করলেন খুব?

সুমিত্রা বললে—রাগ এই জন্যে যে মিথ্যে কথা কেন লিখেচেন?

—যদি বলি মিথ্যে কথা লিখিনি?

—আমি বিশ্বাস করিনে। ঊর্মিলাকে আপনি স্নেহ করতেন না?

—এখনও করি। তাতে কি?

—তবে?

চন্দ্রনাথ হঠাৎ সুমিত্রার অত্যন্ত কাছে এসে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললে—সুমিত্রা, বুঝতে পারচ না কেন? কেন অমন করচ?...এ ক'দিনেও বোঝনি আমার মনের কথা? আমি অনেক দিন আগেই একথা বলতাম সুমিত্রা—কিন্তু আমি ছিলাম গরিব গ্রন্থকার।তুমি এয়ারেস্। তোমার বাবার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। যদি কেউ একথাভাবতো—আমি টাকার লোভে—

সুমিত্রা ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বললে—ছিঃ, ও কথা বোলো না। আমার কখনোএকথা মনে ওঠেনি। আমি বরং বরাবর একথা ভেবেচি—যাক্‌গে, ওসব কথা—

সুমিত্রা কথা শেষ করে পরম নির্ভরতার সঙ্গে চন্দ্রনাথের কাঁধে মাথা রাখলে।চন্দ্রনাথ ওর মাথায় চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কথা শেষ করতে দাওলক্ষ্মীটি। এখন আমার সে ভয় কেটে গিয়েচে সুমিত্রা। যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হোল এবার, বলেছিলুম না দেশের অনেক কিছু ব্যাপার আছে—পরে বলবো সব? সেব্যাপার আর কিছু নয়, আমার নিঃসন্তান জ্যাঠামশায় মারা গিয়েচেন এবং যাবার সময় তাঁর টাকাকড়ি এবং মাঝারি গোছের জমিদারী আমাকে দিয়ে গেছেন। খুব বড়লোক নাহোলেও আমি এখন—

সুমিত্রা আবার ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে—আঃ, তুমি চুপ কর। কে শুনতে চায় তোমার ওই সব বাজে কথা? বললো, আমায় কেমন ভালবাস? এই কথা তোমার মুখে শুনতে চাই।

এই সময় শিবপ্রসাদ আর ঊর্মিলার গলা শোনা গেল ঝোপের ওপাশে। ওরাদুজনেই চুপ করলে।

ঊর্মিলা বলচে শোনা গেল—আর যাই ভাবুন, মনে মুখে দুরকম ব্যবহার করেচি, একথা নিশ্চয় ভাববেন না শিবপ্রসাদবাবু। সব কথা তো আপনাকে বলতে পারিনে, তাহোলে বলতুম—

সুমিত্রা সাড়া দিয়ে বললে—কে, ঊর্মি?

তারপর সে আর চন্দ্রনাথ ঝোপ থেকে বার হয়ে ওদের দুজনের সামনে গিয়েদাঁড়ালো।

ঊর্মিলা জিজ্ঞাসু ও উৎসুক দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই সে সুমিত্রার হাত ধরে বললে—এসো সুমি, কথা আছে, চলো আমরাপুকুরের ধারে বটগাছটার তলায় গিয়ে বসি।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা ডাকবাংলোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে খেটেখুটে একটুবিশ্রাম করছিল। বাকি সবাই কোথায় গেল দেখবার জন্যে ডাকবাংলোর বারান্দা থেকেনামতেই দেখলে তার দাদা শিবপ্রসাদ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে হন্ হন্ করে তার দিকেইআসচে।

প্রতিমা বললে—এঁরা সব কই দাদা? চা এখন কি হবে, না আর একটুদেরি করবো?

শিবপ্রসাদ রাগ ও বিরক্তির সুরে বললে কে জানে? ওঁদের জিগ্যেস করো গিয়ে।

প্রতিমা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে বললে, তোমার আবার কি হোল দাদা?

ঊর্মিলা নিজের ফ্ল্যাটে বসে ছিল। ঘরটা সে বেশ সাজিয়েচে। আজ তার জন্মদিন।দু'চারজন বন্ধুকে সে এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ করেচে। বেলা পাঁচটার মধ্যেই ওরা সব এসে পড়বে।

প্রথমে এল সুমিত্রা। সে এসেই বললে—আজ তোকে কেউ ভালো করেসাজিয়ে দেয়নি ঊর্মি? জন্মদিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্যটাই তো বাকি রয়ে গেছে। চল, ওঠ—দেখি।

একটু পরে শিবপ্রসাদ, প্রতিমা ও ঊর্মিলাদের স্কুলের দু'জন সহকর্মিণী শিক্ষয়িত্রীকেঘরে ঢুকতে দেখা গেল। সুমিত্রা ততক্ষণ ঊর্মিলাকে ভারি চমৎকার সাজিয়ে দিয়েচে। শিক্ষয়িত্রী দুটির মধ্যে একটি প্রৌঢ়া, অপরটির বয়েস

ঊর্মিলার চেয়েও কম, নামশান্তিলতা মিত্র। শান্তি বেশি লাজুক, ঘরে ঢুকে পর্যন্ত তার মুখে বেশি কথা শোনা যায়নি। শিবপ্রসাদকে দেখে বোধ হয় একটু বেশি সংকুচিত হয়ে পড়েচে।

সুমিত্রা দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল—অল্পক্ষণের জন্যে। চন্দ্রনাথেরও আজ এখানে আসবার কথা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার দেখা নেই কেন? সুমিত্রা ভেতরে ভেতরে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

এমন সময় নিচে একখানা মোটর থামবার আওয়াজ পাওয়া গেল। শিবপ্রসাদবললে বোধ হয় চন্দ্রনাথবাবু এলেন।

কিন্তু সুমিত্রা চন্দ্রনাথকে ভালো রকমেই জানে। সে কখনো মোটরে আসবে না—ট্রামবাসের রাস্তা থেকে এইটুকু পথ। তবুও সে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখবার প্রবল ইচ্ছা অতি কষ্টে সংযত করলে।

এমন সময় ঘরের দোরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। শিবপ্রসাদ দোর খুলতেযেত কিন্তু আগন্তুককে চন্দ্রনাথ বলে ধারণা হওয়াতে সে সুমিত্রার ওপর মনে মনে দোর খুলবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত রইল। সুমিত্রাও গেল না, কারণ সে জানে চন্দ্রনাথ এ নয়। চন্দ্রনাথ না হোলেও তার দোর খুলতে বাধা থাকবার কথা নয়, তবুও সে কেন গেল না, নিজেই সে জানে না। প্রতিমা ও শান্তি তখন চা ও খাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে পাশের ঘরে ঢুকচে। সুতরাং গেল ঊর্মিলা।

ঘরে যে ঢুকলো তাকে দেখে সুমিত্রা ও শিবপ্রসাদ দুজনেরই মুখ দিয়ে এক অস্ফুটআনন্দ ও বিস্ময়ের স্বর বার হোল। স্বয়ং সুপ্রকাশ!

ঊর্মিলার সারা দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল—সে অল্প কিছুক্ষণের জন্যেকাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে দুই কর কপালেঠেকিয়ে বিস্ময় ও আনন্দভরা কণ্ঠে বললে—আসুন, আসুন, নমস্কার সুপ্রকাশবাবু।কবে কলকাতায় এলেন?

সুমিত্রাও এগিয়ে এসে বললে—সত্যি আশ্চর্য, এখানে আপনাকে আজ দেখবোএরূপ ভাবিনি। কেমন আছেন সুপ্রকাশবাবু?

সুপ্রকাশ বললে—সব জবাব দিচ্চি, একটু দম নিয়ে নিই। আজই ও-বেলা কলকাতায় এসেচি। সুমিত্রা দেবীর ওখানে গিয়ে শুনলুম এখানেই আপনাদের সকলের দেখা একসঙ্গে মিলবে। তাই এ অনধিকার প্রবেশ। —সেজন্যে ক্ষমা চাইচি।

ঊর্মিলা হাসিমুখে কৃত্রিম রাগের সুরে বললে—থাক, বলতে হবে না। কি যেবলেন সুপ্রকাশবাবু!..বসুন, অত্যন্ত সৌভাগ্য যে এলেন আপনি!

সুমিত্রা বললে—আজ আমরা এখানে কেন জানেন তো? আজ ঊর্মির জন্মদিন।

সুপ্রকাশ একটু ব্যস্ত হয়ে বললে—ও! তাই নাকি? তাহলে আমাকে তো একবারবাইরে যেতে হচ্চে।

ঊর্মিলা কিছুতেই সুপ্রকাশকে যেতে দিলে না, বাইরে যাওয়ার অর্থ জন্মদিনের জন্যকিছু উপহার সংগ্রহ করে আনা তা সে বুঝেছিল। কিন্তু সুপ্রকাশকে এতটুকু কষ্ট দিতেসে চায় না, কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের মমতাবোধ ওর মনে জাগ্রত হয়ে উঠেছেসুপ্রকাশের সম্বন্ধে।

প্রতিমা ও সুমিত্রার সুগৃহিণীপনার গুণে অতিথিদের চা ও জলযোগপর্ব অতি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হোল। সুমিত্রার অনুরোধে ঊর্মিলাকে গান গাইতে হোল। আর গানগাইলে ঊর্মিলার বন্ধু শান্তি। শান্তির মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলের দৃষ্টিআকর্ষণ করলে।

আজ দ্বাদশী তিথি। আকাশ পরিষ্কার, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে। সুমিত্রার প্রস্তাবেসবাই ছাদে উঠলো। ঊর্মিলাও উঠতে যাচ্ছিল, সুপ্রকাশ বাধা দিয়ে বললে—একটুথাকবেন ঊর্মিলা দেবী?

ঊর্মিলা সিঁড়ির নিচের ধাপে তখন দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে সুপ্রকাশের দিকে চেয়েবললে—ছাদে যাবেন না?...শান্তি কেমন সুন্দর গান গায়! চলুন বরং।

কিন্তু সুপ্রকাশের মুখের দিকে চেয়ে ও বুঝলে তার না-বোঝার ভান করা নিরর্থক।ওদের দুজনের জীবনেরই গভীর মুহূর্ত সমাগত। কোনো মিথ্যা ভান করে তাকেঅস্বীকার করলে চলবে না।

সুপ্রকাশ ঊর্মিলার আরও কাছে সরে এসে বললে—ঊর্মিলা জানো, তোমার মুখ চেয়েই শুধু এই ক'মাস প্রাণপণে যত্ন করেচি সেরে ওঠবার। আমি কাল থেকে শুধু এই ভেবে আনন্দ পেয়েছি যে আজ তোমাকে দেখতে পাবো। ব্যান্ডেল স্টেশনে যখন ভোর হোল, ঘুম ভেঙে উঠেই ট্রেনের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি কখন বাংলাদেশে এসে পড়েচি। প্রথম কথাই মনে হোল আজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আচ্ছা, আমার কথা ভাবতে ঊর্মিলা?

ঊর্মিলার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়চে। ওর মুখে কথা নেই।

সুপ্রকাশ আবার বললে—আমার কথার উত্তর দাও, ঊর্মিলা!

এইবার ঊর্মিলা বললে—উত্তরঅনেক দিন আগে দিয়ে রেখেছি।

তার সমস্ত শরীর যেন থর থর করে কাঁপচে এখনও। বোধ হয় ও পড়ে যেতসুপ্রকাশ না ধরে বসলে। ঊর্মিলার নার্ভের অবস্থা কখনো তো খারাপ নয়। নিজের অবস্থা দেখে সে নিজেই চমকে গেল।

সুপ্রকাশ বললে—চল ঊর্মিলা, ওদের কাছে যাই, তোমার বন্ধুরা কি মনে করবেনআবার।...

এই সময় সুমিত্রা ছাদ থেকে দ্রুতপদে নেমে আসতে আসতে ওদের দুজনকেসিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে—ঊর্মি, যা ওপরে। সুপ্রকাশবাবু, যান দেখুন কেমন জ্যোৎস্না!

সুমিত্রাকে তাড়াতাড়ি দোরের দিকে যেতে দেখে ঊর্মিলা আশ্চর্য হয়ে বললে—কিসুমি, যাস কোথায় রে?

সুমিত্রা ব্যস্ততা ও উত্তেজনার মাথায় বললে—উনি—চন্দ্রনাথবাবু আসচেন। সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল কিসের লজ্জায় কে জানে?

ঊর্মিলার হঠাৎ মনে পড়লো চন্দ্রনাথের আজ এখানে আসবার কথা ছিল। তা সেযে আসেনি, একথা এতক্ষণ তার মনেই হয়নি!

সে সুপ্রকাশের মুখের দিকে চেয়ে বললে—চন্দ্রনাথবাবু আমার বড় দাদার মত। আমার একমাত্র অভিভাবক। ওঁকে প্রণাম করে এসব সকলের আগে ওঁকেইবলা দরকার।

দোর খুলে চন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলো। ওর পেছনে যারা ঘরে ঢুকলো, তাদের দেখেসুমিত্রা, সুপ্রকাশ ও ঊর্মিলা সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কারণ ঘরে ঢুকলোঅঞ্জলি ও তার সঙ্গে একটি তরুণ পাঞ্জাবী যুবক। অঞ্জলির বিবাহিতা রমণীর বেশ।

চন্দ্রনাথ বললে—এই জন্যে আমার দেরি হোল ঊর্মিলা দেবী, মাপ করবেন।অঞ্জলি দেবী ওঁর স্বামী মিঃ লাল সিংকে নিয়ে আমার ওখানে গিয়েছিলেন। তারপরএকসঙ্গে সব আসচি। ইনি সুপ্রকাশবাবু, ইনি লাল সিং, ইনি সুমিত্রা দেবী, ইনি ঊর্মিলা দেবী।

সুমিত্রা হাত ধরে হাস্যমুখী অঞ্জলিকে ছাদের ওপর নিয়ে চললো। অঞ্জলির স্বামীপাঞ্জাবী যুবকটি অত্যন্ত সুদর্শন এবং অত্যন্ত বিনয়ী। সুপ্রকাশ তাকে বললে—আসুনমিঃ সিং, আপনিও চলুন। ওপরে খুব হাওয়া।

গল্পগুজব খাওয়াদাওয়ার পরে অনেক রাত্রে একে একে সকলে বিদায় নিলে।সুমিত্রা অঞ্জলিকে পরদিন সকালে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে বিশেষ করে অনুরোধকরলে। অঞ্জলির স্বামীর দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললে—মিঃ সিং, আপনিও আসবেনকিন্তু। অঞ্জলিকে একা ছেড়ে দেবেন না। আমার বন্ধু হোলেও বলচি।

অঞ্জলি কৃত্রিম কোপে তর্জনী তুলে সুমিত্রাকে শাসন করলে। এ বিবাহে সে সুখীহয়েচে—তার মুখের হাসিতে এবং সারাদেহের নবতর লাবণ্যে তার প্রকাশ।

ওরা সবাই চলে গেল, তখনও রইল সুমিত্রা ও চন্দ্রনাথ। আর রইল সুপ্রকাশ।

চন্দ্রনাথ বললে—সুপ্রকাশবাবু, আপনার গাড়িতে আমায় একটু লিফ্‌ট্ দেবেন? মোড় পর্যন্ত। রাত হয়েচে, এবার যাই ঊর্মিলা দেবী। সুমিত্রা কি আরও থাকবে? আমি—

হঠাৎ চন্দ্রনাথকে চমকিত করে দিয়ে সুপ্রকাশ ও ঊর্মিলা চন্দ্রনাথের সামনে নতহয়ে প্রণাম করলে।

ঊর্মিলা চন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—দাদা, আশীর্বাদ করুন।

চন্দ্রনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের দুজনের মাথায় দু'হাত রাখলে। সুমিত্রা তখনঅন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, হয়তো বা আনন্দাশ্রু গোপন করবার জন্যে।